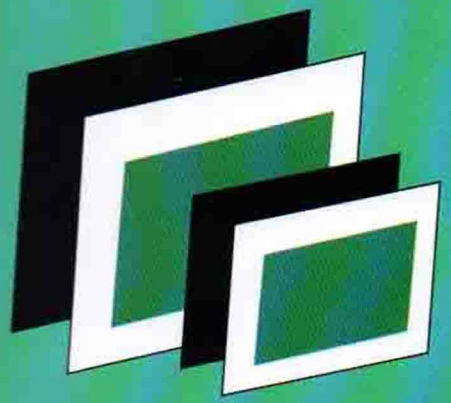

বঙ্গবন্ধুর দ্যুতিময় মেডিয়েশন

আমিনুল হক হেলাল

দি বাংলাদেশ ল' টাইমস

বঙ্গবন্ধুর
দ্যুতিময় মেডিয়েশন

আমিনুল হক হেলাল

বাংলাদেশ ল' টাইমস

Published and Printed by

SAMARENDRA NATH GOSWAMI
Advocate, Appellate Division,
Supreme Court of Bangladesh
Mediator, &
Founder Chairman of Bangladesh International Mediation Society BIMS
24/1, Segunbagicha, At Present, 9, Circuit House Road,
Dhaka-1000, Bangladesh.

First Edition
October, 2020

Sales Center
Supreme Court Bar Building, 3rd Floor, Room No-11
Dhaka-1000, Bangladesh Cell: 01712-281344

Price: BDT: 150/-

উৎসর্গ

প্রতিবাদের মহাসাগর থেকে
বিন্দু পরিমাণ প্রতিবাদ এনে
ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে
দু'পায়ে মাড়িয়েও ক্ষান্ত হলেন না
অবশেষে ঘৃণার আগুনে দগ্ধ করে পাকিস্তানি পতাকা
মহানন্দে-মহাউল্লাসে,
ভাসিয়ে দিলেন বাতাসে
"জয় বাংলা"
আমাদের বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে

বর্ষপঞ্জির পাতায়
দিনটি ছিলো ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ ল' টাইমস্ এর প্রকাশনা তালিকায় ***"বঙ্গবন্ধুর দ্যুতিময় মেডিয়েশন"*** বইটি নতুন সংযোজন। বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেডিয়েশন সোসাইটি-র আনুকুল্যে জনাব আমিনুল হক হেলাল অ্যাডভোকেট কর্তৃক গবেষণাধর্মী এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে বিএলটি পরিবার গর্বিত। বইটির Foreword লিখেছেন Professor Dr. Daniel Eardmann, Founder & Director, World Mediation Organization.

মেডিয়েশন এর ছাত্র হিসেবে আমরা সবাই জানি বিরোধ নিস্পত্তির একটি উপায় হচ্ছে আপস-মিমাংসা বা Mediation। এক বা একাধিক পক্ষসমূহের মধ্যকার বিরোধের আপসমূলক সমাধান হচ্ছে Mediation। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক সাধারণ জনগণ এবং বিশ্ব নেতাদের প্রতি বক্তব্যসমূহ হচ্ছে মেডিয়েশন এর আত্মপরিচয়।

লেখক বইটিতে ১৯ অধ্যায় দ্বারা তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন। গবেষণাধর্মী মন দ্বারা এই বইটি অধ্যায়ন করলে আমরা নিশ্চিত- বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে মেডিয়েশনের ভিত্তি দিয়ে গেছেন। অবতরণিকা অংশের "বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন বিরোধ জিইয়ে রাখলে ক্রোধের পালে বৈরী হাওয়া লাগে। জীবনব্যাপী ন্যায্য পাওনা আদায় করতে বঙ্গবন্ধু যৌক্তিক আলোচনাকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আলোচনার অবর্তমানে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্ব কখনো সুখের হাতছানি পেতে পারেনা।" বাক্য সকল মেডিয়েশন এর প্রাথমিক উৎস বৈকি।

বইটিতে বিরোধ নিস্পত্তিতে বঙ্গবন্ধুর ধারণা, ধরণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে পারব। বাংলাদেশের মেডিয়েশন ইতিহাসের ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, মেডিয়েটর এবং গবেষকদের নিকট Hand Book হিসেবে সমাদৃত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সুখপাঠ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ বইটির পান্ডুলিপি পাবার পর থেকে প্রকাশ পর্যন্ত সহযোগিতার জন্য মোঃ নাজিমুদ্দীন অ্যাডভোকেট এবং ড. রাজিব কুমার গোস্বামী অ্যাডভোকেট এর প্রতি বিএলটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী
অ্যাডভোকেট ও মেডিয়েটর
প্রকাশক ও সম্পাদক
বাংলাদেশ ল' টাইমস

Foreword:

The book ‚Bangabandhu's thoughts on Mediation' is a practical foundation stone for the sustainable development of a culture of mutual respect, beneficial dialog, and peace throughout all levels of society. To build such a society of peace seems to have been an innovative vision from the founding age of Bangladesh onwards.

Due to the collaboration of the authors, the citizens of Bangladesh now receive a manual that supports the implementation of conflict preventing skills to their daily life. It is now time to put theory into practice and to live the change that our millennium asks us to realize.

Personally, I wish all users and practitioners of this content best of luck in creating a future that receives the next generation with open arms and an environment of peace.

Best regards,

Prof. Daniel Erdmann, PhD
Founder & Director
World Mediation Organization

অবতরণিকা

মেডিয়েশন (Mediation) এর আভিধানিক অর্থ মধ্যস্থতা। বহুমাত্রিক জীবনবোধে বঙ্গবন্ধু এই মেডিয়েশনের ভাবনাকে সুবিস্তৃত মহিমায় রাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। সময়ের শ্রেষ্ঠ সাহসী সন্তান বঙ্গবন্ধু মেডিয়েশনের প্রচলিত সংজ্ঞার বাইরে এসে নতুন সংজ্ঞা সৃষ্টি করতে ব্রতী ছিলেন। প্রচলিত মেডিয়েশনের বেড়াজালে বঙ্গবন্ধু কখনো আবদ্ধ থাকেননি। ইতিবাচক ইচ্ছেশক্তি দিয়ে যৌক্তিক মধ্যস্থতায় পৌছাতে আপসী মনোভাবে কল্যাণের স্রোত তিনি বয়ে দিয়েছেন মানুষ-সমাজ-দেশ-বিদেশ এবং আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহে। ৭ই মার্চ বাংলার গনগনে আকাশের নিচে, টগবগে-ফুটন্ত রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ নাছোড়-মানুষের আপসহীন চাওয়াকে চেতনায় ধারণ করেও বঙ্গবন্ধু অবলীলায় উচ্চারণ করেছিলেন মেডিয়েশনের অপূর্ব ধারণাটি, 'একজন যদিও সে হয় তাঁর ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব'। মেডিয়েশনের সরল-চৌহদ্দি অতিক্রম করে সেদিন বঙ্গবন্ধু উর্বর মেধায়, সাহসের সাথে বলতে চেষ্টা করলেন যুদ্ধ-হানাহানিতে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় না। অধিকার প্রতিষ্ঠায় আলোচনা হচ্ছে পৃথিবীর সেরা আশীর্বাদ।

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঘোষণা করার পরেও অবৈধ পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর সাথে বঙ্গবন্ধু একাধিকবার গোল টেবিলে বসেছেন। উদ্দেশ্য একটাই, যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিহার করে আলোচনার মাধ্যমে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় কি না।

তরুন রাজনীতিবিদ শেখ মুজিব ১৯৪৩ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ। 'আমার দেখা নয়াচীন' ভ্রমনকাহিনীতে প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি লিখেছেন, 'রাশিয়া হউক, আমেরিকা হউক, ব্রিটেন হউক, চীন হউক, যে-ই শান্তির জন্য সংগ্রাম করবে তাদের সাথে আমরা সহস্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলতে রাজি আছি, 'আমরা শান্তি চাই'।' কারণ যুদ্ধে দুনিয়ার যে ক্ষতি হয় তা আমরা জানি ও উপলব্ধি করতে পারি; বিশেষ করে আমার দেশে- যে দেশকে পরের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, কাঁচামাল চালান দিতে হয়। যে দেশের মানুষ না খেয়ে মরে, সামান্য দরকারি জিনিস জোগাড় করতে যাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, সে

দেশে যুদ্ধে যে কতখানি ক্ষতি হয় তা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কথা মনে করলেই বুঝতে পারবেন। কোথায় ইংরেজ যুদ্ধ করছে, আর তার জন্য আমার দেশের ৪০ লক্ষ লোক শৃগাল কুকুরের মতো না খেয়ে মরেছে। তবুও আপনারা বলবেন, আজ তো স্বাধীন হয়েছি। কথা সত্য, 'পাকিস্তান' নামটা পেয়েছি; আর কতটুকু স্বাধীন হয়েছি আপনারা নিজের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন। যাহা হউক, পাকিস্তান গরিব দেশ, যুদ্ধ চাইতে পারে না। যুদ্ধ হলে পাকিস্তানের জনগনের সকলের চেয়ে বেশি কষ্ট হবে এই জন্য। তাদের পাট, চা, তুলা অন্যান্য জিনিস বিদেশে বিক্রি না করলে দেশের জনগনের কষ্টের সীমা থাকবে না। দুর্ভিক্ষ মহামারি সমস্ত দেশকে গ্রাস করবে। তাই মানুষের মঙ্গলের জন্য, পাকিস্তানের স্বার্থের জন্য- যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই।'

পক্ষান্তরে ১৯৪৭-এ ভারত বিভক্তিতে ছিল না শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন ধীশক্তিসম্পন্ন রাজনীতিবিদদের মধ্যে কার্যকর আলোচনা এবং মধ্যস্থতা। র‍্যাডক্লিফের কলমের আগায় সেদিন শুধু ফুটে উঠলো ভারতবাসীর জন্যে অনন্তকালের অকল্যাণকর ভয়াবহ রুদ্রমূর্তি। ভারত ত্যাগের পূর্বে ব্রিটিশ কোন আলোচনা না করে ভারতবর্ষের ভূ-খন্ডকে শুধু ক্ষত-বিক্ষত করলো না, ক্ষত-বিক্ষত করলো ভারতের পরিশুদ্ধ আত্মাকেও। যার কারণে আজও বিভাজিত ভারতবাসীর অষ্টপ্রহর কাটে অকল্পনীয় দুঃখ-কষ্টে। ১৯৪৭ এর মধ্য আগস্টের পর থেকে সীমান্তবর্তী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষগুলো শুরু করলো নিত্যনতুন অচেনা-অজানা বিরোধ নিয়ে বসবাস করতে। তরুন রাজনীতিবিদ শেখ মুজিব বিষয়টির গভীরে গিয়ে আবেগে নয়, বাস্তবতার জমিনে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখলেন, 'নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিমলীগ বা অন্য কারোর সাথে পরামর্শ না করেই ঘোষণা করলেন ঢাকাকে রাজধানী করা হবে। তাতেই আমাদের কলকাতার উপর আর কোনো দাবি রইল না।' তিনি বিশ্বাস করতেন নেতৃত্বের হানাহানির কারণে সেদিন নেতারা কোন আলোচনার টেবিলে না বসে ভারতবাসীকে অনন্তকালের জন্যে পঙ্গু করে দিলো।

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্গবন্ধু জীবনব্যাপী আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, কূটনৈতিক, বৈদেশিক সমস্যার সমাধানে পৌছাতে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। কখনো তিনি সফল, কখনো বিফল। বঙ্গবন্ধু সমস্যার

গভীরে গিয়ে আলোচনান্তে যে সমঝোতায় পৌছানোর চেষ্টা করতেন- তাকে আমরা মেডিয়েশনের নতুন দিগন্ত হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

'আপসহীন' শব্দটি ক্ষমতাবান মানুষকে স্বৈরাচারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। 'আপসহীন' শব্দটি সাধারণ মানুষকে একগুঁয়ে হতে নির্লজ্জভাবে আমন্ত্রণ জানায়। বঙ্গবন্ধু প্রায় সময় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মধ্যস্থতা করার প্রশস্ত পথ খুঁজে বেড়াতেন। দীর্ঘ অন্ধকার-অমানিশার শেষ প্রান্তেও তিনি আলোচনার জন্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখতেন। অর্থনৈতিকভাবে অতীতে সমৃদ্ধ শেখ বংশের বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা দেখে তিনি তা আবেগহীনভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। মুরুব্বীদের কাছ থেকে তিনি শেখ বংশের দূরাবস্থার কারণ হিসেবে মামলা-মোকদ্দমার কথা জেনেছেন। এজন্যে তিনি জীবনব্যাপী বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির কথা ভাবতেন। ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির, গোষ্ঠির বিরুদ্ধে গোষ্ঠির, সমাজের বিরুদ্ধে সমাজের এমনকি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের বিরোধ সৃষ্টি হলেও তিনি আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রেখে সমস্যা সমাধানের পথ চিনে নিতেন। এককথায় বঙ্গবন্ধু সব সময় বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে আলোচনাকে প্রাধান্য দিতেন।

বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন বিরোধ জিইয়ে রাখলে ক্রোধের পালে বৈরী হাওয়া লাগে। জীবনব্যাপী ন্যায্য পাওনা আদায় করতে বঙ্গবন্ধু যৌক্তিক আলোচনাকে প্রাধান্য দিতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আলোচনার অবর্তমানে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র তথা বিশ্ব কখনো সুখের হাতছানি পেতে পারে না। 'বঙ্গবন্ধুর দ্যুতিময় মেডিয়েশন' বইটি পাঠ করলে আশা করি বঙ্গবন্ধুর মতো অনেক বিদগ্ধজন বিরোধ নিষ্পত্তিতে বিকল্প পদ্ধতির সুগন্ধ পাবেন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রস্তাবনা	০১
মহামানবের দাফন-কাফনে মেডিয়েশন	০৪
আমি আমার লাশের জন্য কবরের জায়গা চাচ্ছি না জনাব প্রেসিডেন্ট	১০
হাতে বটি নিয়ে বসে আছি	১৫
একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব	২১
মুজিব অর্থ সঠিক উত্তরদাতা	২৯
শুধু বিস্কুট খেয়ে কাটালেন তাঁরা স্বাধীন দেশে দুইদিন	৩৫
আমার সোনার বাংলা	৪০
আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্যে কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়	৪৭
নেতারা যদি নেতৃত্ব দিতে ভুল করে জনগণকে তার খেসারত দিতে হয়	৬০
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি	৬৯
পদ্মার ঢেউরে মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যারে	৭২
গাফফার, খবরদার এরপর কারও চেহারা-সুরত নিয়ে ঠাট্টা করবা না	৭৪
মনোরঞ্জন ধর ব্যাচেলর মানুষ	৭৭
টাকা আমি গুনিনা, মেপে রাখি	৭৯
বাবা একটু পানি চেয়েছিল	৮২
তোমাদের বাপ-ব্যাটার ব্যাপার, আমি বাবা আর হাঁটতে পারি না	৮৫
লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি	৮৭
মামলার ভয় দেখিয়ে লাভ নাই	৯০
মেডিয়েশনে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানের মধ্যে ক্যাডিলাক গাড়ি	৯২
যে দেশে বিচার ও ইনসাফ মিথ্যার উপর নির্ভরশীল	৯৫

প্রস্তাবনা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পঁয়তাল্লিশ বছর নেই মর্ত্যলোকে। ছিলেন মাত্র পঞ্চান্ন বছর। সব মিলিয়ে এবছর শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে মুজিব। মর্ত্যলোকের নাতিদীর্ঘ জীবনের শুরুতে খোকা নামে পরিচিত শিশুটি হৃষ্ট-পুষ্ট, নাদুশ-নুদুশ ছিলেন না। রোগা-ছিপছিপে পাতলা ছিলো তাঁর গড়ন। এজন্য বাবা-মায়ের অনেক আক্ষেপ ছিলো। দুধ-ছানা-মাখন খেয়ে বেড়ে উঠা গ্রামবাসীর মিয়া ভাই, বাঙালির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শাব্দিক অর্থে আজ আর নেই। বাঙালি জাতির পিতা মুজিব ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫-এ নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার হওয়ার পর ৫৭০ সাবানের ফেনা মেখে হয়তো সেদিন কোন কষ্ট পাননি। যে কিশোর মুজিব পরনের পায়জামা-পাঞ্জাবী গরীব ছেলেকে দিয়ে গায়ের চাদর জড়িয়ে মায়ের কাছে ফিরতেন, সেই মুজিব পরিণত বয়সে পাড় ছিঁড়া রেডক্রসের সাদাকাপড়ের কাফন পরার মধ্যেও কোন গ্লানি খুঁজে পাননি। বরং সেদিন প্রত্যুষে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর কিছু উদভ্রান্ত-বিপথগামী সেনা সদস্যের হিংস্রতায় খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন, কষ্ট পেয়েছিলেন আমাদের বঙ্গীয় ব-দ্বীপের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর দেশবাসী অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখেছে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫-এর ঘটনার নেপথ্যে কিছু মানুষ সদৃশ জানোয়ারের বিভৎস চেহারা। তারা আর কেউ ছিলো না। তারা ছিলো বঙ্গবন্ধুর অতি কাছের, অতি ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত সহচর।

শতবর্ষে মুজিব আজ মাতৃভূমি থেকে মৃত্যুভূমিতে ঘুমিয়ে আছেন। বঙ্গবন্ধু পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি কায়া নিয়ে আজ আর বন্দি নেই টুঙ্গিপাড়ার স্নিগ্ধ-কোমল মাটির ঘেরাটোপে। তাঁর পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি কায়া আজ ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার প্রতিপ্রান্তে। ছড়িয়ে পড়েছে উত্তরের হিমালয় থেকে দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরে। বাংলার প্রতিদিনের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তে, সূর্যাস্ত থেকে

সূর্যোদয়ে। সব মিলিয়ে ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধু আজ শুধু শতবর্ষীমানব নয়, একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে এসে তিনি আজ মহামানব। নাতিদীর্ঘ এ জীবনে বঙ্গবন্ধু হেঁটেছেন মর্ত্যলোকের অনেক পথ। পথের বাঁকে বাঁকে তিনি তাঁর জনপদের শিকড় সন্ধান করেছেন দূরদৃষ্টিতে, পরম-মমতায়। অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন এ বাংলার সুনীল আকাশ, মেঠো পথ, খাল-বিল-মাঠ, শিল্প-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিত্ত-বৈভব। কিশোর বয়সেই বেরিবেরি আর গুকোমায় আক্রান্ত মুজিব চশমা চোখে চর্যাপদ-চন্ডিদাস-রবীন্দ্র-নজরুল-জসিম-জীবনানন্দকে ধারণ করে সুকান্তর মতো কিশোর-বালকের বিপ্লবকে আলিঙ্গন করেছেন। চেষ্টা করেছেন বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার স্বপ্নসারথি হতে। জ্বলে উঠতে চেয়েছেন শেখ বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে। পরিশেষে, নাতিদীর্ঘ জীবনে বাংলার প্রতি ধূলিকণায় তিনি ছড়িয়েছেন তাঁর জীবনের পরিশুদ্ধ মহিম-আলো। জীবনব্যাপী শিকড় সন্ধানী বঙ্গবন্ধু বিপন্ন-বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছেন শেখ বংশের সম্পদ আস্তে আস্তে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে আসার কারণগুলো। ট্রেনে চলতে চলতে কিংবা চারণকবিদের কবিতায়-গানে তিনি কখনো কখনো জানতে চেষ্টা করেছেন ক্ষয়িষ্ণু শেখ বংশের ইতিহাস। সত্য সন্ধানের জন্যে বাড়ির মুরুব্বীদের নিকট শেখ বংশের অর্থনৈতিক-গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় জানতে ব্রতী হয়েছেন। অতীত সন্ধানী বঙ্গবন্ধু এজন্যেই শেখ বংশের অবনতির নেপথ্য কারণগুলো ব্যবচ্ছেদ করতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধু "অসমাপ্ত আত্মজীবনী"র শুরুতে গভীর কষ্টে খেদোক্তি করেছেনঃ

"শেখ বংশের সব গেছে"।

বন্ধু-পিতা মুজিব একদিন খেদোক্তি করে বলেছিলেন, 'শেখ বংশের সব গেছে'। কিন্তু ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫-এর সকালে বাঙালির কী যে হারিয়ে গেল চিরতরে, বাঙালি কী তা বুঝতে পেরেছিলো! বন্ধু-পিতা, আমরা আপনার অবর্তমানে তিলে তিলে জেনেছি- আপনি ছিলেন আমাদের দিগন্তজোড়া আকাশ। ছিলেন বিশুদ্ধ বাতাস। ছিলেন বাঙালির চেতনার সূর্য। আপনার অবর্তমানে এ'বাংলায় অনেকদিন দাবড়িয়ে বেড়ালো স্বৈরাচারী আর্মির শাসন-শোষণ। পিতা, আপনি চলে যাবার পর এ'দেশে সূর্য উঠত ঠিকই- কিন্তু তেজ ছিলো না। আপনি চলে যাবার পর অনেক দিন মাঠ ভরে ফসল হতো না। আপনি চলে যাবার পর কষ্টের

গান শুনাতো বনের পাখিরা। মাছগুলো সাঁতার কাঁটতো বিষণ্ন নদ-নদী-পুকুরে, কষ্টের জলে।

বন্ধু-পিতা, আপনি কি জানেন আপনার শালপ্রাংশু রক্তাক্ত-নিথর দেহ কিছু উচ্ছৃঙ্খল আর্মির রক্তচোখের পাহারায় ৩২ নম্বরে অবহেলায়-উপেক্ষায় পড়ে ছিলো অনেক সময়। সাহসী বাঙালির অন্তরে হঠাৎ সেদিন ভর করেছিলো ভীরুতার পাহাড়। বিশ্বাস করুন পিতা, সেদিন আপনাকে কেউ দেখতে আসেনি ভীরুতার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে। ক্ষমা করবেন আমাদের। ক্ষমা করবেন বাঙালিদের।

বন্ধু-পিতা, আপনি বড় বেশী ভালবাসতেন আপনার টুঙ্গিপাড়াকে। টুঙ্গিপাড়ার মানুষও আপনাকে পাগলের মতো ভালবাসতো। আর্মির তর্জন-গর্জনে, কড়া পাহারার দেয়াল টপকে আপনাকে টুঙ্গিপাড়ার মানুষও সেদিন বিদায় জানাতে আসেনি। গোসল ছাড়া 'ওরা' আপনাকে দাফন-কাফন করতে চাইলে- কেউ প্রতিবাদ না করলেও প্রতিবাদ করেছিলেন মৌলভি আব্দুল হালিম- যাকে আপনি শেষ দেখায় বলেছিলেন, 'আমার জানাযা আপনাকেই পড়াতে হবে'। মৌলভি হালিম সেদিন একাই সমস্ত বাঙালির শক্তি নিয়ে আর্মির সঙ্গে লড়েছিলেন। একপর্যায়ে আর্মি শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৌলভি আব্দুল হালিমের কথা মেনে নেয়। বন্ধু-পিতা, আপনার লাশকে কেন্দ্র করে আর্মির সঙ্গে মৌলভি হালিমের যে আপস-মীমাংসা হয় সেটিই আজ আমাদের কাছে আলোকিত মেডিয়েশন।

মহামানবের দাফন-কাফনে মেডিয়েশন

ভাষা আন্দোলন আমাদের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে অনিবার্য করেছে। মুক্তিযুদ্ধ ভূমিষ্ট হয়েছে ভাষা আন্দোলনের চেতনা থেকে। ভাষাকেন্দ্রিক দেশ এবং জাতীয়তা সৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধুর সাফল্য উপমাহীন। যা সারা পৃথিবীতে আজও অনন্য কীর্তির উদাহরণ হয়ে আছে। বাঙালির পরম আরাধ্য সেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে এক বাঙালি মেজর বিকৃত ভাষায়, কর্কশ কণ্ঠে ঘোষনা করলো, 'শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে'। বাঙালি হয়ে বাঙালির মুক্তির দূতকে এভাবে হত্যা করবে- প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি। সেদিনের ভয়াবহতার প্রেক্ষিতে আবুল ফজলের প্রতিক্রিয়া ছিলোঃ

'শেখ মুজিব নেই। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট তাঁকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ওইদিন ভোর সাড়ে ছ'টায় হত্যাকারীদের এক মুখপাত্র ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করেছেঃ 'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে'। যাকে বলে এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। সারা দেশ স্তব্ধ ও হতবাক। মন বিশ্বাসই করতে চায় না- বাংলাদেশে, যে বাংলাদেশের স্রষ্টা স্বয়ং শেখ মুজিব, এমন অকল্পনীয় ঘটনা ঘটতে পারে। সারাদেশ বোবা, বিস্মিত, হতবুদ্ধি।

শেখ মুজিব না থাকাটা যে বাংলাদেশের জন্য কত বড় শূন্যতা তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি ছিলেন সারা দেশের সামনে ঐক্যের প্রতীক ও ঐক্য

রক্ষাকারী এক মহাশক্তি। সে প্রতীক, সে শক্তি আততায়ীর গুলিতে আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। এ নির্মম ঘটনায় যন্ত্রণাবিদ্ধ আমরা সবাই। সে যন্ত্রণা ভাষার অতীত। তাই তার বহিঃপ্রকাশ নেই কোথাও। সবাই ছটফট করছে ভিতরে ভিতরে। বিবেকী মানুষদের বিবেক কাতরাচ্ছে অহরহ।

আমাদের সামনে আজ এমন কোন মহৎ কবি নেই, যে কবি বাংলাদেশের অন্তরের এ নীরব কান্নাকে ভাষায় কিংবা ছন্দে রূপ দিতে পারেন।'

বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে যে বাঙালি ১৯৭১-এ স্বাধীনতা এবং মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করলো, অনেক ত্যাগ স্বীকার করলো, সেই বাঙালিকেই শুনতে হলো বাঙালির আশা-আকাঙ্খার একমাত্র প্রতীক বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর। বাঙালির কষ্ট আসলে একদিনের নয়। অনন্তকাল থেকেই বাঙালির ভাগ্য ললাটে কষ্ট নিবিড়ভাবে লেপ্টে আছে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার করুণ পরিণতি বাঙালিরা শুধু চেয়ে দেখেছে- কোন প্রতিবাদ করেনি। ১৭৫৭-এর ৫৭ উল্টালে ৭৫ হয়। ১৯৭৫-এ এসেও বাঙালি আবার শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলো তাদের মুক্তির দূতকে, বাংলাদেশের স্রষ্টাকে কিভাবে হত্যা করলো তাঁরই কাছের, তাঁরই ঘনিষ্ঠজন। ১৫ই আগস্ট, শুক্রবার, শ্রাবণের শেষ দিন। রাতের অন্ধকারের শেষপ্রান্তে, ঠিক উষালগ্নে এসে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে ফেলে রেখেছিলো। পরের দিন শনিবার উড়োজাহাজে বঙ্গবন্ধুর লাশ নিশ্ছিদ্রপাহারায় টুঙ্গিপাড়ায় এনেছিলো লেঃ কঃ হামিদ। একটা বাক্সে বরফ দিয়ে লাশটি ঢাকা ছিলো। টুঙ্গিপাড়া থানার ওসি নুরুল আলম চৌধুরী আগেই সংবাদটি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির মসজিদের ইমাম মৌলভি আব্দুল হালিমকে দিয়ে রেখেছিলো। ওসির কথামতো মৌলভি সাহেব, মিস্ত্রি আলী আজগর মিয়ার সাহায্যে দুটো কবর খুঁড়লেন। একটি বঙ্গবন্ধু, অন্যটি বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছার জন্যে। 'হায় হাসান, হায় হোসেন'- বলতে বলতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী শিয়া সম্প্রদায় যেমন মাতম করে, কবর খুঁড়তে খুঁড়তে, মনে মনে সে রকম মাতম করছিলেন মৌলভি আব্দুল হালিম। সেদিন তার চাপা কান্না দেখার কেউ ছিলো না। মৌলভির অন্তরে বার বার মনে পড়ছে শেষ সাক্ষাতে বঙ্গবন্ধু তাকে বলেছিলেন- 'আমার জানাযা আপনাকেই পড়াতে হবে।'

অবশেষে বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়ার পবিত্র মাটিতে এলেন। প্যাকিং করা বরফ ঢাকা লাশ। বারো (১২) জন সেনা নিয়ে লেঃ কঃ হামিদ পুলিশী পাহারায় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে লাশ দাফনের পাঁয়তারা শুরু করলো। লাশ দাফনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিক্ষুব্ধ মৌলভি আব্দুল হালিমের সাথে লেঃ কঃ হামিদের কথা কাটাকাটি শুরু হলো। লাশ দেখার পর ইমাম সাহেব লেঃ কঃ হামিদকে জানালেন দু'ঘন্টা সময় লাগবে। লেঃ কঃ হামিদ কিছুতেই সময় দেবে না। মৌলভি হালিম তাকে জানালেন শরিয়ত অনুযায়ী গোসল করাতে ও জানাযা পড়াতে সময় লাগবে। লেঃ কঃ হামিদের ক্রোধ-জিঘাংসা তখনো শেষ হয়নি। কোন ইসলামী বিধি-বিধান ছাড়াই লাশ দাফন করা যায় কিনা জানতে চাইলে ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন, একজন মুসলমানের লাশ গোসল ছাড়াই দাফন করা যায়, যদি সে শহিদ হয়। হামিদ তখন অস্থির এবং অসহিষ্ণু গলায় জানতে চাইলো, আপনি দাফন করাবেন কি না? ইমাম বললেন, না, তা আমি পারব না। যদি লিখে দেন যে, শহিদ করে এনেছেন তাহলে পারবো। ইমাম সাহেবের বুক জুড়ে তখন শুধু বঙ্গবন্ধুর শেষ কথাটি 'আমার জানাযা আপনাকেই পড়াতে হবে'। লেঃ কঃ হামিদ ক্রুদ্ধস্বরে বললো, না সেটা লিখতে পারবো না। ঠিক আছে, গোসল করান। তবে দেরি করতে পারবেন না। শত নিরাপত্তার মধ্যেও কর্ণেল খুব টেনশনে ছিলো। সেনা সদস্য ও পুলিশকে বারবার সতর্ক থাকার কড়া নির্দেশ দিলো। অস্থিরতায় ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে থাকলো।

মৌলভি আব্দুল হালিম ৫৭০ সাবান দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে পরম মমতায় ইসলামী কায়দায় গোসল করালেন। রেডক্রস থেকে চার ইঞ্চি পাড়ের সাদা শাড়ি এনে পাড় ছিঁড়ে ফেলে কাফনের কাপড় বানানো হলো। মৌলভি বঙ্গবন্ধুর নিথর শরীর ভালো করে নেড়েচেড়ে পরিস্কার করতে করতে দেখতে পেলেন একটা গুলির চিহ্ন বঙ্গবন্ধুর মাথার পেছনে। তিনি আরো দেখলেন বুকের নিচে চক্রাকারে নয়টা গুলির চিহ্ন এবং আঙ্গুলেও গুলির চিহ্ন। বঙ্গবন্ধুর পায়ের রগ কাটা দেখতে পেয়ে মৌলভি সাহেবের অন্তরে অনেক প্রশ্ন জেগে উঠলো- যে মানব কখনও মাথা নীচু করেননি, নিজে সবসময় মাথা উঁচু রেখে- স্বজাতির মাথা উঁচু করেছেন- সেই মহামানবের মাথাটি আজ কীভাবে ঘাতকেরা গুলিতে ছিন্ন-ভিন্ন করলো! যে মানব তাঁর বিশাল বুকে বাংলা আর বাঙালিকে ছাড়া কাউকে ধারণ করেননি- সেই মহামানবের স্নেহ-ভালোবাসা-মমতায় ভরা বুক আজ কীভাবে ঘাতকের গুলিতে

ঝাঝরা হলো! যে মহামানবের অঙ্গুলি হেলনে বাংলায় স্বাধীনতা এলো- সে আঙ্গুলও আজ ঘাতকেরা কীভাবে গুলি করে উড়িয়ে দিলো! একটি শরীরে এত তান্ডব চালিয়ে ঘাতকেরা অবশেষে মৃত্যু সুনিশ্চিত করার জন্যে কীভাবে বঙ্গবন্ধুর পায়ের রগ কাটল! ভাবতে ভাবতে আর নিজেকে প্রশ্ন করতে করতে মৌলভি সাহেব বঙ্গবন্ধুর বিশাল শরীরটি সম্পূর্ণ ধৌত করলেন। বঙ্গবন্ধুকে ধৌত করা রক্তের নোনা জল আর সব বাঙালির একমাত্র প্রতিনিধি মৌলভি হালিমের চোখের নোনা জলের অভিন্ন ধারায় বঙ্গবন্ধুর লাশ দাফন হয়ে গেল। কবরের উপরে মাটি চাপা দিয়ে, উঠোনের বরই গাছের কাঁটাভরা ডাল চাপানো হলো তার উপর। হেলিকপ্টার চলে যাবার আগে, অবচেতন মনে টুঙ্গিপাড়ার মাটিকে আবার হয়তো পবিত্র করার জন্যে বাইগার নদীর পানিতে বঙ্গবন্ধুর শরীর থেকে ঝরে যাওয়া শেষ রক্তটুকুও ধুয়ে টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে রেখে যায় ঘাতকের দল।

১৫ই আগস্টের প্রত্যুষ থেকে সারা বাংলা ছিলো থমথমে। ঢাকা শহরের অবস্থা ছিলো ভয়াবহ। রাস্তাঘাট ছিলো লোকশূন্য। রাজপথ দাবড়ে বেড়াচ্ছে ঘাতকেরা। বঙ্গবন্ধুর অতিঘনিষ্ঠজন- যারা বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবারকে হত্যার নেপথ্যে ছিলো, তারা আবার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্যে ঘাতকদের সাথে হাত মিলিয়েছে। অবহেলায়-অবজ্ঞায় বঙ্গবন্ধুর পড়ে থাকা লাশ কেউ সাহসের অভাবে দেখতে আসলো না। ১৫ই আগস্টে বীর বাঙালি হঠাৎ করে ভীরু-কাপুরুষ হয়ে গেল। বাংলা যেন বিরান ভূমি। কেউ কোথাও নেই। সব কিছু যেন হুমায়ুন আজাদের কবিতা হয়ে গেলোঃ

'আমি জানি সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।
নষ্টদের দানবমুঠোতে ধরা পড়বে মানবিক
সব সংঘ-পরিষদ, চলে যাবে, অত্যন্ত উল্লাসে
চলে যাবে এই সমাজ-সভ্যতা-সমস্ত দলিল
নষ্টদের অধিকারে ধুয়েমুছে, যে রকম রাষ্ট্র
আর রাষ্ট্রযন্ত্র দিকে দিকে চলে গেছে নষ্টদের
অধিকারে। চলে যাবে শহর বন্দর ধানক্ষেত
কালো মেঘ লাল শাড়ি সাদা চাঁদ পাখির পালক
মন্দির মসজিদ গির্জা সিনেগগ পবিত্র প্যাগোডা।'

সেদিন শুধু সাহসী ছিলো মৌলভি আব্দুল হালিম। ঘাতকের প্রতিনিধি লেঃ কঃ হামিদের সঙ্গে বীর বাঙালির মতো লড়েছিলেন, তর্ক করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন। তর্ক এবং যুক্তি দিয়ে কর্ণেলের নিকট থেকে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুসনদে 'শহিদ' শব্দটি লিখাতে চেয়েছিলেন মৌলভী আব্দুল হালিম। ধূর্ত কর্ণেল রাজী হলো না। কোন প্রমাণপত্র দিলো না। লাশের কোন ধর্ম নেই। তবুও পৃথিবীর যেকোন দেশে লাশ বেওয়ারিশ হলে সবার আগে নিশ্চিত হতে হয়- জীবিত অবস্থায় সে আস্তিক, নাকি নাস্তিক ছিলো। আস্তিক হলে কোন্ ধর্মের অনুসারী ছিলো। সে মোতাবেক রফা-দফা হয়। শুধু ব্যতিক্রম বঙ্গবন্ধু। লাশের গোসল দেবে না। শহিদ হয়েছে কিনা- লিখিত দেবে না। বঙ্গবন্ধুর মেঝো চাচা এবং ছোট চাচী লাশ সনাক্ত পর্যন্ত করেছে। চাচা-চাচী খোকার লাশ দেখে কেঁদেছে, চিৎকার করেছে আর বলেছে এটি তাদের খোকার লাশ। যে খোকা মনেপ্রাণে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। যে খোকা জীবনে ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করেনি। যে খোকা ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের সময় মুসলিম লীগের হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সংগ্রাম করেছে, লড়াই করেছে। যে খোকা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে কত মসজিদ- মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে, সংস্কার করেছে। যে খোকা ও.আই.সি সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ রক্ষায় সোচ্চার হয়েছে। যে খোকা বাংলাদেশে ইসলামী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে 'ইসলাম' নিয়ে গবেষণা-চর্চা করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যে খোকা হরেক রকম উদ্যোগ নিয়ে 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে- এটি সেই খোকার লাশ।

পরিস্থিতি-পরিবেশ আর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অনেক স্মৃতি নিয়ে ইমাম সাহেব সেদিন মেডিয়েটরের ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রথম পক্ষ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর এখানে কিছুই করার ছিলো না। মৃত্যুর আগে শেষ দেখায় প্রথম পক্ষ (বঙ্গবন্ধু, পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর লাশ পড়তে হবে) ইমাম সাহেবকে বলেছিলেন মৃত্যুর পর তাঁর জানাযা যেন ইমাম সাহেব পড়ান। ১৬ই আগস্ট ১৯৭৫-এ প্রথম পক্ষ হচ্ছে একটি নিথর-নিস্তেজ-বরফ ঢাকা পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চির অবয়ব ছাড়া আর কিছুই নয়। সেদিন তাঁর কোন বাদ-প্রতিবাদ, আন্দোলন-সংগ্রাম, আপস-মীমাংসা করার মতো অবস্থা ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষ স্বাধীন দেশের গৌরবের সেনাবাহিনী- যে বাহিনী নিয়ে মানুষ গর্ব করে, সেই বাহিনীর কিছু উচ্ছৃঙ্খল সদস্য- যারা প্রথম পক্ষকে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। নিথর লাশ আর সশস্ত্র সেনাবাহিনী

দুপক্ষের মধ্যে মৌলভি আব্দুল হালিম সাহস নিয়ে মেডিয়েটরের দায়িত্ব পালন না করলে বঙ্গবন্ধুকে গোসল ও জানাযা ছাড়াই তাঁর প্রিয় টুঙ্গিপাড়ার শান্ত-স্নিগ্ধ-কোমল মাটিতে শায়িত করা হতো। যেমন করা হয়েছে রাজধানী শহর ঢাকায়- একজন মৌলভি আব্দুল হালিমের মতো মেডিয়েটরের অভাবে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবকে, যেমন করা হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামালকে, যেমন করা হয়েছে লন্ডনের স্যান্ডহার্স্ট আর্মি একাডেমি থেকে সেনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শেখ জামালকে, যেমন করা হয়েছে শিশু শেখ রাসেলকে, যেমন করা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসেরকে, যেমন করা হয়েছে শেখ কামালের স্ত্রী দেশের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ সুলতানা কামাল খুকিকে, যেমন করা হয়েছে শেখ জামালের স্ত্রী যার হাতে তখনো মেহেদীর রং ছিলো সেই নববধু পারভীন জামাল রোজীকে, যেমন করা হয়েছে আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে, যেমন করা হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনিকে, যেমন করা হয়েছে শেখ মনির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মনিকে, যেমন করা হয়েছে একমাত্র আর্মি অফিসার, বঙ্গবন্ধুর অন্তিম ডাকে সাড়াদানকারী কর্ণেল জামিল উদ্দিন আহমেদকে, যেমন করা হয়েছে পনের বছর বয়সী কিশোরী বেবী সেরনিয়াবাতকে, যেমন করা হয়েছে এগারো বছর বয়সী আরিফ সেরনিয়াবাতকে, যেমন করা হয়েছে চার বছরের অবুঝ শিশু সুকান্ত আব্দুল্লাহ বাবুকে, যেমন করা হয়েছে শহীদ সেরনিয়াবাতকে এবং আবদুল নঈম খান রিন্টুকে।

১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধেও তরতাজা এ'প্রাণগুলোকে পাকিস্তানি হায়েনারা যদি হত্যা ক'রে মাটিতে পুঁতে রাখতো, গণকবর দিতো তাহলেও এ'পরিণতির জন্যে বাংলার প্রকৃতি কোন কষ্ট পেতো না। বাংলার মানুষের কোন গ্লানি থাকতো না। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর একটি জাতির সদ্য স্বাধীন পূণ্যভূমিতে মহান স্বাধীনতার স্বপ্নপুরুষ, জাতির জনকের পরম প্রিয় মানুষগুলোকে বাঙালির একটি ক্ষুদ্র-ভ্রষ্টাংশ এ কী করলো? এ হিংস্রতার, এ বর্বরতার কষ্ট-বেদনা হাজার বছরেও কি বাঙালির লাঘব হবে?

তথ্যসূত্রঃ

১। অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
২। শেখ মুজিব তাঁকে যেমন দেখেছি, আবুল ফজল ঃ বাতিঘর
৩। ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫, সম্পাদনা ঃ শেখ হাসিনা এবং বেবী মওদুদ। প্রকাশনা ঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

আমি আমার নিজের লাশের জন্য কবরের জায়গা চাচ্ছি না জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব

বঙ্গবন্ধু জীবনের সকল স্তরে আলোচনা করতে ভালোবাসতেন। আলোচনার মাধ্যমে জটিল সমস্যাগুলো সমাধান করার সহজ পথ খুঁজতেন। 'বিচার মানি তাল গাছ আমার' এই মানসিকতা বঙ্গবন্ধু কখনো পোষণ করতেন না। আলোচনার মধ্যে কল্যাণ অন্তর্নিহিত থাকে এই বিশ্বাসে তিনি তাঁর সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে তিনি লক্ষ্য করলেন, যে সুখ-শান্তি-প্রগতি আর গণতন্ত্রের প্রত্যাশায় পাকিস্তান সৃষ্টি হলো- সেই পাকিস্তানে সুখ-শান্তি এবং নিরাপত্তার লেশমাত্র নেই। পাকিস্তান সৃষ্টির পর গভর্ণর শাসনব্যবস্থায় পাকিস্তান শাসিত-শোষিত হতে শুরু করলো। ব্রিটিশ শাসন-শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ভারত যখন গণতন্ত্রের সূর্যালোকে আলোকিত, পাকিস্তান তখন সন্দেহের দোলাচলে অন্ধকার গলিপথে গণতন্ত্র হারিয়ে ফেলেছে। পাকিস্তানের জনগণ তখন বুঝতে শুরু করলো ব্রিটিশ থেকে বেরিয়ে এ যেন উত্তপ্ত কড়াই থেকে উনুনে ঝাঁপ দেবার মতো অবস্থা। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের অল্প কিছুদিন পরেই সামরিক শাসনের যাতাকলে পাকিস্তান পিষ্ট হতে শুরু করলো। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে বঙ্গবন্ধু বিকল্প পন্থা খুঁজতে শুরু করলেন। তিনি অনেক চেষ্টা করলেন সামরিক শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনার। যে আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে গণতন্ত্রের সুবাতাস। পাওয়া যাবে মানুষের মুক্তচিন্তা ও মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা। পাওয়া যাবে সমস্ত শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির আশ্বাস। যে আলোচনা শেষে পাওয়া যেতে পারে

দেশবাসীর জন্যে পাকিস্তান নামক ফলপ্রসূ কল্যাণকর রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্র গণতন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে উন্নয়ন এবং প্রগতির দিকে অগ্রসর হতে থাকবে।

ভাবনা থেকে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় মুছাফির ভাইকে রাওয়ালপিন্ডি পাঠালেন। মুছাফির ভাই হলেন ইত্তেফাকের সম্পাদক, আমাদের সুপরিচিত তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে, মানুষের বাক স্বাধীনতার জন্যে ছয় দফার পক্ষে তাঁর ক্ষুরধার কলমের কলাম ছিলো ঋদ্ধ। মুক্তিকামী মানুষ তাঁর কলামে খুঁজতে শুরু করেছিলো গণতন্ত্রের ঠিকানা। বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত মানিক মিয়া যখন রাওয়ালপিন্ডি, পূর্ব বাংলার আকাশ-বাতাস তখন স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে উত্তাল। তারপরও বঙ্গবন্ধুর বিশ্বাস প্রিয় মানিক ভাই নিশ্চয়ই সামরিক জান্তা প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে বৈঠক করে একটি আপসসূত্র বের করবেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। হঠাৎ হৃদয় বিদীর্ণ করে বঙ্গবন্ধুর কর্ণকুহরে একটি সংবাদ এলো। যে সংবাদে বঙ্গবন্ধু শুধু নয়, গভীর কষ্টে বাংলার বাতাসও কেঁপে উঠলো। যে মানুষ পূর্ব বাংলার উত্তাল সংগ্রামের কথা সামরিক জান্তাকে বলতে গেলেন, যে মানুষ অবাধ সাধারণ নির্বাচনের কথা বলতে গেলেন, যে মানুষ গণতন্ত্র আর মানুষের মুক্তির কথা বলতে গেলেন, সেই মানুষই কিনা এভাবে না ফেরার দেশে চলে গেলেন!

মানিক মিয়া ১৯৬৯ সালের ১লা জুন মারা যাবার পর তার মরদেহ রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঢাকায় আনা হলো। মরদেহ বাংলাদেশে আনার পর সমস্যা হলো কোথায় সমাহিত করা হবে। কেউ মতামত দিলো সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করলে গণতন্ত্রের দুই লড়াকু সৈনিককে এক সাথে দেখে বাঙালি বারবার জেগে উঠবে, অনুপ্রাণিত হবে। বাঙালিরা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে, সংগ্রামের জন্যে বারবার শপথ নিতে আসবে এই তীর্থভূমিতে। কেউ বললো, তাঁর স্বপ্নের 'ইত্তেফাক হল ঘরে' সমাহিত করলে ইত্তেফাক তাঁর আবেগ ধারণ করে বাংলার স্বায়ত্বশাসনের পক্ষে কাজ করতে সাহস পাবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় বঙ্গবন্ধুও অন্যান্যদের মতো ভাবলেন, মানিক মিয়াকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়ে উপযুক্ত জায়গায় সমাধিস্থ করা যায় কিনা।

মানিক মিয়াকে কোথায় দাফন করা হবে তা নিয়ে তৎকালীন সর্বদলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও ইয়াহিয়া খান সাহেবের সাথে অনেক দর কষাকষি

চালালেন। কোনভাবেই ইয়াহিয়া সাহেব কারো কথায় কর্ণপাত না করায় অবশেষে বঙ্গবন্ধু এগিয়ে এলেন। এদেশের একজন কৃতিসন্তানকে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যার কলম ছিলো সোচ্চার, পূর্ব বাংলার মুক্তি সনদ ছয় দফার পক্ষে অবশেষে যার অকুতোভয় কলম ছিলো বেগবান সেই কলমযোদ্ধা মানিক মিয়াকে যোগ্য জায়গায় সমাহিত করা যায় কিনা তার শেষ চেষ্টার ব্রত নিয়ে বঙ্গবন্ধু জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে বললেন, 'সিরাজ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাহেবকে ফোন লাগাতো--- দেখি তো খান সাহেব আমার কথা শোনে কিনা'। বঙ্গবন্ধুর কথানুযায়ী জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাহেবকে ফোন করলেন। জনাব সিরাজ লক্ষ্য করলেন দু'জনের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ কিছু কথোপকথন হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু একপর্যায়ে বলে উঠলেন,

'আমি আমার নিজের লাশের জন্য কবরের জায়গা চাচ্ছি না জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব --- চাচ্ছি বাংলাদেশের এক দেশপ্রেমিক শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্য। আপনি অনুমতি দিতে পারছেন না--- বেশ। ঠিক আছে বাংলার মাটিতে দয়া প্রার্থনা করতে হবে না। যদি কোনদিন সময় আসে মানিক মিয়ার জন্য মনুমেন্ট তৈরি করবো। তিনি আরো বললেন জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব আমার জন্য ভাবি না--- বাংলার কোন গ্রামে ধান ক্ষেতের পাশে অথবা বাঁশ বাগানে আমার কবর হবে--- বাংলার মাটিতে শুয়ে বাংলার মাটির স্বাদ পাবো, বাংলার পাখির গান শুনবো, বাংলার সোনালী ধানের ঘ্রাণ পাবো। তবে প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনি শুনে রাখেন আপনি যখন কবরের জায়গা দেবেনই না তখন আমি মুজিব বলছি, এদেশে কোন পাঞ্জাবি মারা গেলে আমি বাংলার মাটিতে তাকে কবর দিতে দেবো না।'

এমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীকে বিনয়ের সঙ্গে বলছি, স্মৃতির সঙ্গে একটু কথা বলে আমাদের কী জানাবেন- ইয়াহিয়ার সাথে টেলিফোনে কথা বলার সময় বঙ্গবন্ধুর ভাবনা জগতে কী 'নজরুল' ভর করেছিলো? নাকি আশেপাশে মাইকে, উচ্চস্বরে নজরুলের গান বঙ্গবন্ধুকে আলোড়িত করেছিলো? ঘটনাস্থলে আপনারা কী কেউ তখন তাঁকে নজরুলের গানটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন? বাংলার বিদ্রোহী কবি আর সফল রাজনীতির কবি কিভাবে সুরের অন্তমিল অভিন্ন রেখে ভিন্ন প্রকৃতির ভাষায়, ভিন্ন ভাবধারায়

সমাধি-লিপি রচনা করতে পারলেন? ১৯৪০-এর জুলাই মাসে বিদ্রোহী কবির লেখা 'এপিটাফ' ১৯৭৬ এর ২৯শে আগষ্টে পূর্ণতা পেলোঃ-

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই,
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে।

১৯৬৯-এর ১লা জুন ইয়াহিয়াকে স্বপ্নের এপিটাফের কথা জানানোর পর বঙ্গবন্ধুকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। অবচেতন মনে বঙ্গবন্ধু সেদিন সামরিক শাসককে এপিটাফ-এর ভাষা জানিয়ে দিয়েছিলেন। সামরিক বাহিনীর 'Chain of Command' সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর স্বচ্ছ ধারণা ছিলো। পাকিস্তানী সামরিক অফিসারকে যে দায়িত্ব পালন করার জন্য বঙ্গবন্ধু অনুরোধ করলেন সেই দায়িত্বটি অতি দ্রুত পালনের জন্যে এগিয়ে এলো স্বাধীন বাংলার সেনাবাহিনীর বিপথগামী কিছু সেনা সদস্য। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগষ্টে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর তাঁকে সমাহিত করার জন্যে তারা নিয়ে গেলেন ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা, শান্ত-স্নিগ্ধ টুঙ্গিপাড়ায়। এ যেনো মৃত্যুর ২২৬৫ দিন পূর্বে টেলিফোনে ইয়াহিয়াকে বলা বঙ্গবন্ধুর সরল বিশ্বাসের আবেগি কথাগুলোকে বিশ্বাসঘাতকতার অলিন্দে ঢুকিয়ে দিলো নিষ্ঠুর-দুঃসাহসী আস্ফালনে। এ যেন বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো বাঙালির কষ্টের দহনে বাস্তবায়নের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করতে এগিয়ে এলো আবেগহীন শকুন আর শেয়ালের দল। এ যেনো বঙ্গবন্ধুর অবচেতন মনের চাওয়াকে, ইচ্ছেকে খুব দ্রুততার সাথে পূর্ণতা দিতে মেতে উঠলো অশুভ পাঁয়তারায় কোন এক অশুভ শক্তি।

বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় মানিক ভাইকে রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠালেন ইয়াহিয়া সাহেবের সাথে আলোচনার জন্যে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! আলোচনার পূর্বেই তিনি চলে গেলেন- বাংলাকে কাঁদিয়ে, গণতন্ত্রকে কাঁদিয়ে। বঙ্গবন্ধু প্রিয় মানিক ভাইকে উপযুক্ত জায়গায় সমাহিত করার জন্য সামরিক জান্তার সঙ্গে আলোচনা করলেন। লাশ নিয়েও অপরাজনীতি করতে সামরিক জান্তা ইয়াহিয়ার

সেদিন বুক কাঁপেনি, হৃদয় কাঁপেনি। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করে ইয়াহিয়া যখন রাজি হলো না তখন বঙ্গবন্ধু তাকে বলেছিলেন কোনদিন সময় এলে মানিক মিয়ার জন্যে মনুমেন্ট তৈরি করা হবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর কথা রেখেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকার সবচেয়ে বড় সড়কটির নাম রেখেছেন 'মানিক মিয়া এভিনিউ'। সংসদ ভবনের দক্ষিণে প্রশস্ত রাস্তাটি মানিক মিয়া এভিনিউ নামে পরিচিত। স্বাধীন বাংলার রাজধানী ঢাকায় মানিক মিয়া এভিনিউ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কেউ কী একটু থামে? কেউ কী মনে মনে বঙ্গবন্ধুর প্রিয় মানিক ভাইয়ের মনুমেন্টের কথা ভেবে একটিবারের জন্যে স্মরণ করে- 'দাঁড়াও পথিক- বর, জন্ম যদি তব বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল!'

তথ্যসূত্রঃ

* জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (শততম জন্ম স্মারক গ্রন্থ)ঃ বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা ও কিশোর বাংলা'র যৌথ প্রকাশনা

হাতে বটি নিয়ে বসে আছি

কস্তুরবার এবং কমলা নেহেরুর মতো স্বামীর কখনো জেলসাথি হননি ফুজিলাতুন্নেছা। স্বামীর জেলবন্দি থাকার সময়ে তিনি পারিবারিক দায়িত্ব নীরবে, নিভৃতে পালন করতেন। বাবা-মায়ের মতো আপনজন শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-যত্ন করতেন। দেবর-ননদদের প্রতি দায়িত্বপূর্ণ নজর রাখতে কখনো কার্পণ্য করেননি। সন্তান লালন-পালনে তিনি ছিলেন বাংলার সফল শাশ্বত মা। স্বামীর উপস্থিতিতে পছন্দসই রঙিন শাড়ি পরলেও জেলবন্দি সময়ে মুজিবের কষ্টে তিনি সবসময় সাদা কাপড় পরতেন।

আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলায় স্বামী শেখ মুজিবের জীবন বিপন্ন। দেশদ্রোহীর তকমায় মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে স্বামীকে। গণ-আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে রুপান্তরের অসম্ভবকে সম্ভব করার ব্রত নিয়ে বোরখা পরে জনসংযোগে নামলেন- শেখ মুজিবের প্রিয়তমা রেণু। এ যেন বাংলার আরেক বেহুলা। এ বেহুলা শুধু স্বামীর জীবন নিয়ে চিন্তা করছেন না। করছেন দেশ এবং দশের মঙ্গল নিয়ে। তাঁকে বাঁধা দিতে শুরু করলো গোয়েন্দাসংস্থা। বাংলার এ বেহুলা বেগম মুজিবকে কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদ করে গ্রেফতারের হুমকি পর্যন্ত দিলো গোয়েন্দাসংস্থা।

ঘটনাগুলোর অনতিঅতীতে শেখ মুজিবের বর্ণময় ভূমিকায় নেপথ্যে ভূমিকা রেখেছিলেন বেগম মুজিব। সময়ের খরচায় দিন যত অতিবাহিত হচ্ছে ইতিহাসের পরিসর তত ব্যপ্ত হচ্ছে বেগম মুজিবের। 'ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা'য় লেখক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কলম বেগম মুজিবকে নির্মাণ করেছেন শেখ মুজিবের ঔজ্জ্বল্যের নেপথ্য কারিগর হিসেবেঃ

'১৯৬৬ সালের গোড়ার কথা। তখনো ছয় দফার আন্দোলন শুরু হয়নি। এমন কি ছয় দফা কর্মসূচীও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়নি। বঙ্গবন্ধু তখন ঢাকার গুলিস্তান সিনেমার কাছে তখনকার 'আল্‌ফা ইনস্যুরেন্সে'র ভবনে নিয়মিত বসেন। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে আমি বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম।

একদিন দুপুরে দেখি বঙ্গবন্ধু আলফায় তাঁর নিজের কামরায় একাকী বসে আছেন। তাঁর মুখ খুব গম্ভীর। জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো খারাপ খবর? তিনি জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, একটা মুভমেন্ট শুরু করতে চাচ্ছি। এই মুভমেন্ট ছাড়া বাংলার মানুষের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বললাম, সেজন্যই কি আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে?

বঙ্গবন্ধু বললেন, না, আমার চিন্তার কারণ ভিন্ন। মুভমেন্ট তো শুরু করতে চাই, কিন্তু জোরালো সমর্থন পাচ্ছি না অনেকের কাছ থেকে। 'ইত্তেফাকের' মানিক মিয়া দ্বিধাগ্রস্ত, আমার দলের প্রবীণ নেতারা ভীত। অথচ দলের তরুণ ও ছাত্রদের মধ্যে অদম্য উৎসাহ। তাদের ইচ্ছা আমি এগিয়ে যাই।

বললাম, তাহলে তো আপনাকে এগিয়ে যেতেই হবে।

ঃ আমি গ্রীন সিগন্যালের অপেক্ষায় রয়েছি। বঙ্গবন্ধু বললেন।

ঃ আপনাকে আবার গ্রীন সিগন্যাল কে দেবেন?

ঃ তোমাদের ভাবী। বঙ্গবন্ধু পাইপে টোবাকো পুরলেন। বললেন, এবার যে আন্দোলন শুরু করতে যাচ্ছি, তা খুবই বিপজ্জনক। আন্দোলনে জয়ী হতে না পারলে কেবল জেল জুলুমেই সব শেষ হবে না। হয়তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলানোরও ব্যবস্থা হতে পারে। এত বড় ঝুঁকি নেওয়ার আগে তোমাদের ভাবীর সঙ্গে একটা খোলাখুলি আলোচনা দরকার।

ঃ যদি তিনি অনুমতি না দেন? আপনাকে এত বড় ঝুঁকি নিতে বারণ করেন?

বঙ্গবন্ধু বললেন, সে কথা ভেবেও আমি চিন্তিত। আমি আর কারো বিরোধিতাকে ভয় করি না। কিন্তু হাসিনার মা বেঁকে দাঁড়ালে আমার পক্ষে মুভমেন্টে নামা কষ্ট হবে।'

আমাদের অনেকের বিশ্বাস ঊনসত্তরের গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থান সফল হয়েছিলো মওলানা ভাসানীর সম্মোহনী নেতৃত্বের কারণে। ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করে সরাসরি বলা যায় মওলানা ভাসানী সেসময় ছিলেন বিকল্পহীন অদ্বিতীয় নেতা। কিন্তু সময় সময় অদৃশ্য কারণে তিনি নিজেকে উজ্জীবিত রাখতে পারতেন না। তাঁকে উজ্জীবিত-উদ্দীপ্ত রাখতে নেপথ্যে কোনো কোনো মানুষের প্রয়োজন হতো। একটি উদাহরণ দিয়ে প্রাসংগিক বিষয়টিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি-

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে আসামী করা হলে সারাদেশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৬৮ সালের প্রারম্ভে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সংবাদ প্রকাশিত হলে দেশের মানুষের মধ্যে থমথমে অবস্থা বিরাজ করে। দেশ এক ভীত-সন্ত্রস্ত শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মুখোমুখি হলো। প্রথম পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর কোন খোঁজ না পাওয়া গেলেও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অফিসার্স ক্লাবে ছোট একটি ঘরে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হলো। জানা গেলো বঙ্গবন্ধুর অবস্থান। মামলা শুরুর প্রথমে দেশবাসীর পক্ষে প্রতিবাদী আন্দোলন কেউ গড়ে তুলতে পারেনি। সময়ের একটু হেরফেরে ১৯৬৮ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে দেশের রাজপথ কেঁপে উঠলো। আন্দোলন শুরু হলো প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তানের আন্দোলনের ঢেউয়ে পূর্ব পাকিস্তানও একসময় প্লাবিত হতে শুরু করলো। তোফায়েল, রব, মাখন এবং অন্যান্য নেতাদের সভা-মিছিলে ঢাকার রাজপথে নেমে এলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, নেমে এলো শ্রমিক-জনতা। বিক্ষুব্ধ জনতার মিছিলের অগ্রভাগে একসময় দেখা গেলো মওলানা ভাসানীকে। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ-বাতাস যখন প্রকম্পিত। ক্যান্টনমেন্টের জেলে বসে তখন শেখ মুজিব ভাবলেন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সাথে গণঅভ্যুত্থানের পালক সংযুক্ত করতে প্রয়োজন মওলানা ভাসানীকে। বঙ্গবন্ধু ভালোভাবে জানতেন গণঅভ্যুত্থান না হলে তাঁর জীবন হবে বিপন্ন।

ক্যান্টনমেন্টের অফিসার্স মেসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালে আসামীরা বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলো। কিছু সাংবাদিক

যোগাযোগের একটি সূক্ষ্ম-সূচছিদ্র পথ তৈরী করলেন। ছোট ঘর সদৃশ আদালতে সাংবাদিকরা প্রথম সারিতে বসতেন। সাংবাদিকদের আসন থেকে শেখ সাহেবের অবস্থান ছিলো বেশ সন্নিকটে। দৈনিক আজাদের প্রধান প্রতিবেদক জনাব ফয়েজ আহম্মেদ প্রথম সারিতে বসতেন। বিচারকার্য চলাকালে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের মাধ্যমেই কিছু খবর আদান-প্রদান করতেন। একদিন জনাব ফয়েজ আহম্মেদের অসুস্থতার কারণে জনাব আতাউস সামাদের স্থান হলো ফয়েজ সাহেবের জায়গায়। সুযোগ বুঝে শেখ সাহেব আতাউস সামাদকে বললেন, 'মওলানাকে গিয়ে বল আমার মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে, বিশেষ কর্মসূচী দিতে'।

বঙ্গবন্ধুর এই অনুরোধ মওলানা সাহেবের কাছে পৌছাতেই কিছুক্ষণ চুপ থেকে চিরচেনা মেজাজে বললেন 'আন্দোলন করবো তবে আইয়ুবের গোল টেবিলের পর'। আইয়ুব খান তখন তার গদি রক্ষার জন্যে রাজনৈতিক নেতাদের গোল টেবিলে বসবার জন্যে বারবার আহ্বান করছেন। মওলানা ও ভুট্টো সেই বৈঠক বর্জন করার উদাত্ত আহ্বান জানালেন। শেখ মুজিবের কথানুযায়ী আতাউস সামাদ দেখা করে হুজুরকে বললেন, শেখ সাহেবতো আপনার এগার বছর জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'এদেশে রাজনীতি করতে হলে তাঁর আমাকে প্রয়োজন হবে, আমারও তাঁকে নিয়ে রাজনীতি করতে হবে'। কথাটি শুনে মওলানা প্রীত হলেন নাকি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন? বুঝা না গেলেও তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠে বেরিয়ে এলো; 'মজিবর একথা বলেছে? ঠিক আছে, তাকে মুক্ত করে ছাড়ব'।

'খামোশ' হুংকার দিয়ে তারপরের দিনই পল্টন ময়দানে মওলানা আঙুল তুলে লক্ষ জনতার সমাবেশকে নিয়ে গেলেন আন্দোলনের চরম মাত্রায়। মুজিব মুক্তির আন্দোলনের জোয়ারের ঢেউয়ে শ্লোগান উঠতে শুরু করলো 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। শুরু হলো সেই বিখ্যাত জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন। নিষ্কৃতি পেল না মন্ত্রীদের গাড়ি-বাড়ি। নিষ্কৃতি পেল না আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান বিচারপতি এস এ রহমানের কুঠিবাড়ি। আন্দোলনের ভয়াবহ রূপ অনুধাবন করে রাতের আঁধারে প্রধান বিচারপতি পালিয়ে গেলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করতে গতিময় ইতিহাস ৭১-এর দিকে এগিয়ে চললো। ভাসানীর বিখ্যাত 'খামোশ' হুংকারের পর যে আন্দোলন

শুরু হলো সে আন্দোলনের স্রোতে ভেসে গেলো আইয়ুবের গোল টেবিল বৈঠকের সমস্ত আয়োজন।

ইতিহাসের পাশাপাশি কিছু কিংবদন্তি বাস করে। গুঞ্জন শুরু হলো শেখ সাহেব মুচলেকা দিয়ে প্যারোলে মুক্তি পেতে যাচ্ছেন। শেখ মুজিবকে পাকিস্তানে নেওয়ার জন্যে ইতোমধ্যে ঢাকা বিমানবন্দরে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটা বোয়িং চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিভ্রান্ত হতে শুরু করলো বাংলার জনগণ। বাংলার প্রতিবাদী জনগণের মিছিলের কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে শুরু হলো। বিভ্রান্ত মানুষ চিন্তা করছে এত প্রাণ এত রক্ত যে নেতার জন্যে দেয়া হলো সেই নেতাই যদি মুচলেকা দিয়ে আইয়ুবের দরবারে যায় তাহলে এসবের কী দরকার ছিলো। মুচলেকা দেবার ব্যাপারে ওই সময় শেখ মুজিব স্বয়ং দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। সিদ্ধান্তহীনতার প্রতিটা মুহূর্ত তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করছে। মুজিবের বিপন্ন এ সময়ে টিফিন ক্যারিয়ারের বাটির তলায় ৩২ নম্বর থেকে ছোট একটি চিরকুট এলো। প্রেমপত্র নয়, ভালোবাসার সুগন্ধি নেই এই চিরকুটে। চিরকুটে বঙ্গবন্ধুর রেণু লিখেছেন, 'হাতে বটি নিয়ে বসে আছি, প্যারোলে মুচলেকা দিয়ে আইয়ুবের দরবারে যেতে পারেন; কিন্তু জীবনে ৩২ নম্বরে আসবেন না'।

সাহসী শেখ মুজিব অবশেষে দ্বিধার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে মুচলেকা দিলেন না। প্যারোলে মুক্ত হলেন না। ভাসানী তাঁর কথা শেষ পর্যন্ত রেখেছিলেন। গোল টেবিলে শেখ মুজিব যেতে সম্মত হলেন না। আইয়ুবও ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকতে পারল না। ক্ষমতার জোরে আইয়ুব গোল টেবিল বৈঠকে ব্যর্থ হয়ে জনতার আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হলো। ক্ষমতা হস্তান্তর করলো আরেক সেনাপ্রধান ইয়াহিয়ার কাছে। ফাঁসির আসামী শেখ মুজিব আইয়ুবের গোল টেবিলে না যেয়ে অবশেষে ফিরে এলেন বাঙালির সংগ্রামী সত্তায়, ফিরে এলেন স্বাধীনতার কাছাকাছি, ফিরে এলেন বাংলাদেশ সৃষ্টির স্বপ্ন বুননের উজ্জ্বল দিগন্তে। টিফিন ক্যারিয়ারের সেদিনের ছোট চিরকুটটি আন্দোলনরত জনতার সাথে শেখ মুজিবের একটি সেতুবন্ধন সৃষ্টি করলো। এই চিরকুট সেদিন জন্ম দিলো উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নতুন দিকনির্দেশনা। এই চিরকুট সেদিন শেখ মুজিবকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করলো। এই চিরকুট সেদিন ফাঁসির মঞ্চ

থেকে মুজিবকে ছিনিয়ে এনেছিলো। এই চিরকুট সেদিন জন্ম দিলো ভাসানীর কণ্ঠে তেজোদীপ্ত 'খামোশ' শব্দটি। কিংবদন্তি এই চিরকুট সেদিন সংগ্রামী জনতার সাথে শেখ মুজিবের একটি আলোচনার দ্বার নিঃশব্দে খুলে দিয়েছিলো। সংগ্রামী জনতা সেদিন কোন কথা বলেনি। শেখ মুজিব কোন কথা বলেননি। কথা বলেছে শুধু এই চিরকুট। চিরকুটের নীরব ভাষা ছিলো, 'নেতা তোমাকে জনগণের ভাষা বুঝতে হবে'। এই চিরকুটই সংগ্রামী জনতার সাথে সারাজীবন লড়াকু-সাহসী অথচ ক্ষণকালের জন্যে সিদ্ধান্তহীন দ্বিধাগ্রস্ত-বিপন্ন নেতা শেখ মুজিবের সাথে আপস করে দিয়েছিলো। এই চিরকুটই জনতার নেতাকে আইয়ুবের গোল টেবিলে যেতে নিরুৎসাহিত করেছিলো। এই চিরকুটই সেদিন বহন করেছিলো সংগ্রামী জনতার ভাষা। মনে দ্বিধা রেখে বলতে হয়, এই চিরকুট সেদিন শেখ মুজিবের বাল্যসাথি- সহমরনসাথি- রেণু না পাঠালে শেখ মুজিব হয়তো ডুবে যেতেন স্বখাতসলিলে। এজন্যেই হয়তো শেখ মুজিব আলফা ইন্স্যুরেন্স অফিসে বসে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে বলেছিলেন- নতুন 'মুভমেন্ট' এর জন্যে 'তাঁর প্রয়োজন রেণুর গ্রীন সিগন্যাল।'

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবের 'মুভমেন্ট'-এ বেগম মুজিবের সমর্থনের ধারাবাহিকতায় সফল ঊনসত্তরের সিঁড়ি বেয়ে উত্তাল একাত্তরের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঙালির একটি ধারাবাহিক রক্তাক্ত অধ্যায় অথচ সোনালী অর্জন।' ৬৯-এ রেণুর এই চিরকুট দৃশ্যত কোন আলাপ-আলোচনা নয়। এই চিরকুটের মাধ্যমে আন্দোলনরত সংগ্রামী জনতার সাথে মুজিবের একটা মমতাময় সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়েছিলো মাত্র।

তথ্যসূত্রঃ

* ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ঃ জ্যোৎস্না পাবলিশার্স
* মুজিব ভাই, এবিএম মূসা ঃ প্রথমা প্রকাশন
* যে জাতি জননীকে সম্মান দিতে জানে না, তার অবমাননা পদে পদে- নীলিমা ইব্রাহিম।

একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব

দ্যুতি ছড়াতে পছন্দ করতেন না বঙ্গবন্ধু। প্রতিপক্ষের কুকথা গায়ে মাখতেন না কখনো। স্বভাব সুলভ কাজ করতেন, রাজনীতি করতেন। নিজে স্বপ্ন দেখতেন, মানুষকে স্বপ্ন দেখাতেন। দশের কাজ করতে করতে একসময় দেশের কাজে অপরিহার্য হয়ে উঠলেন তিনি। দেশ-জাতি-বঙ্গবন্ধু একাকার হয়ে গেল সময়ের চাহিদায়। বিশ্ব দেখলো এক মহান নেতা। নেতার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়লো সারাবিশ্বে। রাজনীতির উত্তাল সময়েও তিনি আলোচনাকে গুরুত্ব দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো- আলোচনা অব্যাহত রাখলে সমস্যা আর সমস্যা থাকেনা। এজন্যে তিনি কখনো আলোচনার পথ বন্ধ করতেন না। তাঁর দেহ-মন-মননে আলোচনার বিষয়বস্তু সব সময় গুন গুন করতো। সংলাপ করতো। আলোচনায় বসবার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বারবার ডাকতেন, আহ্বান করতেন- অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করতেন। সহজ করে বললে বলা যায়, আলোচনার মৃদু-মন্দ বাতাসের আভাস পেতে তিনি সব সময় খোলা রাখতেন তাঁর দরজা-জানালাসহ সম্ভাব্য সমস্ত পথ-ঘাট। বিপন্ন অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি মনে-প্রাণে আলোচনাকেই প্রাধান্য দিতেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো। শত ষড়যন্ত্রের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বঙ্গবন্ধু সরকার গঠন করতে পারলেন না। বারবার আলোচনা-বৈঠকে বসেও জনগণের ম্যান্ডেডকে পাকিস্তানী কর্তাব্যক্তিরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করলো। বেগতিক অবস্থায় মুজিব তখন ন্যায্য অধিকার আদায়ের

দাবীতে বাংলার জনগণকে নিয়ে আন্দোলন-মিছিলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করলো। ছাত্র-শ্রমিক-কৃষকসহ সকল স্তরের মানুষ নেমে পড়লো। আন্দোলন-সংগ্রামে মুখরিত হলো বাংলার রাজপথ, মেঠোপথ। বাঙালির শ্লোগানের ভাষা- 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, পূর্ব বাংলা স্বাধীন করো'। সব নিয়ন্ত্রণ তখন শেখ মুজিবের। তাঁর নির্দেশে দেশ চলতে লাগলো। এ এক অভাবনীয় ঘটনা। এ অবস্থায় অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিলো সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণাই হবে উত্তম পথ। অনেকে আবার বললো আরো কড়া আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হবে আমাদের। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে উপযুক্ত জবাব দিতে অন্যান্য পথেরও সন্ধান দিলো কেউ কেউ। বঙ্গবন্ধু সবার কথা মনোযোগী মনে শুনতেন। গুরুত্ব দিতেন। বুঝতে চেষ্টা করতেন। দৃশ্যত বঙ্গবন্ধু তাদের কথা মেনে নিলেও মনে নিতে পারেননি।

এ বাংলার মাঠ-ঘাট-রাজপথ আন্দোলনের বিশুদ্ধ জলবায়ুতে যখন উত্তাল-পরিপূর্ণ-টগবগে, ঠিক তখন এগিয়ে এলেন একজন অতি সাধারণ বাঙালি রমণী। যার বিয়ে হয়েছিলো মাত্র তিন বছর বয়সে বার কিংবা তের বছরের এক বালকের সাথে। পান খেতে পছন্দ করতেন তিনি। অন্যকে খাওয়াতেও দ্বিধা করতেন না। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পুঁজি নিয়ে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত এই নিভৃতচারী রমণী বাংলার আলোহীন-অনাবিস্কৃত ইতিহাসে আজ দীপ্যমান। সমসাময়িক সময়ে রচিত ইতিহাসকে তুড়ি মেরে এই সাধারণ রমণী আজ বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে অনিবার্য ঐতিহাসিক চরিত্র। অগ্নিগর্ভ বাংলার আকাশে-বাতাসে কুকথা আর ষড়যন্ত্রের বিষ যখন রটছিলো, তখন এই রমণী বঙ্গবন্ধুকে নিখাদ আদর আর শাসনের স্বরে বললেন 'একটু বিশ্রাম নাও'।

স্মৃতির ভেলায় ভেসে নষ্টালজিয়া কাতর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবেগমথিত কলমে ঘটনাটি এভাবে স্মৃতিচারণ করেছেন ঃ

'জনসভায় যাওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে আব্বা কাপড় পরে তৈরি হবেন, মা আব্বাকে নিয়ে ঘরে এলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আব্বাকে বললেন ১৫ মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকার জন্য। আমি আব্বার মাথার কাছে বসে মাথা টিপে দিচ্ছিলাম। মা বেতের মোড়াটা টেনে আব্বার কাছে বসলেন। হাতে পানদান, ধীরে ধীরে পান বানাচ্ছেন আর কথা বলছেন। যে কোনো বড় সভায় বা গুরুত্বপূর্ণ

কাজে যাওয়ার আগে আমার মা আব্বাকে কিছুক্ষণ একদম নিরিবিলি রাখতেন। সেদিন আব্বার একটু সর্দি ছিলো। আমি গলায়-কপালে ভিক্স মালিশ করে দিলাম। কাঁথাটা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকলেন। আমার মা আব্বাকে বললেন, সমগ্র দেশের মানুষ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সবার ভাগ্য আজ তোমার ওপর নির্ভর করছে। তুমি আজ একটা কথা মনে রাখবে, তোমার সামনে লাঠি, পেছনে বন্দুক। তোমার মনে যে কথা আসে তুমি তাই বলবে। অনেকে অনেক কথা বলতে বলেছে। তোমার কথার উপর সামনের অগণিত মানুষের ভাগ্য জড়িত। তাই তুমি নিজে যেভাবে যা বলতে চাও নিজের থেকে বলবে। তুমি যা বলবে সেটাই ঠিক হবে। দেশের মানুষ তোমাকে ভালোবাসে, ভরসা করে।'

তার সেই দিনের আদরমাখা সান্নিধ্যে, মমতাপূর্ণ শাসন-উপদেশে আজ আমরা পেয়েছি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। এ ভাষণ এখন শুধু বাঙালির নয়, সারা পৃথিবীর কাছে অমূল্য। ৭ই মার্চের ভাষণ আজ পৃথিবীর অনেক বিদগ্ধ-জ্ঞানীর কাছে গবেষণার বিষয়।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন বক্তৃতা করেছেন। সব নেতার বক্তব্যের চুলচেরা বিশ্লেষণে আজ আর আমরা যাবো না। শুধু একটি ভাষণের কথা আমরা আলোচনা করবো। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বিখ্যাত ভাষণ "Give me blood, I will give you freedoom"। নেতাজীর ভাষণে ভারতবাসী উদ্দীপ্ত হয়ে আন্দোলন করলো, সংগ্রাম করলো, রক্ত দিলো। অন্যদিকে পাকিস্তানী রক্তচোখ উপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে বললেন- 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'। দুটি ভাষণের তুলনামূলক আলোচনা করলে দাঁড়ায়- একটি ভাষণ রক্ত দেবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করছে, উদ্বুদ্ধ করছে। কিন্তু নিজেকে সমর্পিত করছে না। দেশবাসির রক্তস্রোতের সাথে নেতাজীর রক্তস্রোত বহমান হচ্ছে না। তিনি যেন তাঁর ভাষণে বিনিময়ের আভাস দিলেন। ভারতবাসীকে তিনি রক্ত দেবার আহ্বান করলেন- তার বিনিময়ে তিনি স্বাধীনতা এনে দেবার আশ্বাস দিলেন। অপরদিকে ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু জনতার সাথে, বাঙালির সাথে-দেশবাসীর সাথে একাকার হলেন। কোন পক্ষ-বিপক্ষ রাখলেন না। তিনি বললেন, "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো"। রক্ত দেবার জায়গায় তিনি নিজেকে সংগ্রামী মানুষের সাথে একাকার করলেন। রক্ত দেবার প্রত্যয়ী বাসনা

ব্যক্ত করলেন। সংগ্রামী মানুষের রক্তধারায় নিজের রক্তধারা প্রবাহিত করলেন। কোন বিভক্তি-বিভাজন রাখলেন না। বঙ্গবন্ধু জনতার কাতারে শুধু রক্ত দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। ভাষণের পরের বাক্যেই তিনি বললেন 'এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ'। এখানেই বঙ্গবন্ধু অন্যদের থেকে আলাদা। নেতৃত্বের গুণে এখানেই বঙ্গবন্ধু হাজার মাইল এগিয়ে গেলেন। এজন্যে তিনি সফল। জনতার রক্ত আর তাঁর রক্ত একই স্রোতধারায় এনে এদেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখালেন। দেশকে মুক্ত করার দৃঢ় ঘোষণায় মানুষকে জাগিয়ে তুললেন। এখানেই বঙ্গবন্ধু। এখানেই জাতির পিতা। এখানেই স্বাধীনতা নির্মাণের নিপুণ কারিগর। অন্যদের থেকে হাজার মাইল এগিয়ে এখানেই বঙ্গবন্ধু স্বতন্ত্র মহিমায় আলোকিত। এই ভাষণে কী ছিলো, কী নেই। ছিলো শাসন-শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস। ছিলো জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনকে পদদলিত করার ধারাবাহিক বর্ণনা। ছিলো যুদ্ধ করার প্রত্যয়ী অভিপ্রায়। ছিলো বাঙালি কীভাবে মুক্তি আর স্বাধীনতাকে আলিঙ্গন করে কোন্ পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে- তার নিখুঁত রণকৌশল। 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই- নিধিরাম সর্দার' জেনেও এই ভাষণ বাঙালিকে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে আকুল করে তুললো। এই ভাষণে বাঙালি উজ্জীবিত হলো। প্রেরণা পেলো। অবশেষে সংগ্রামী বাঙালি তার মনন-মেজাজ-শরীরকে স্বাধীনতার বেদিতে উৎসর্গ করলো।

বাঙালির জীবনে একদিনে কিন্তু ৭ই মার্চ আসেনি। একদিনেই বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের মতো অনুপম বক্তৃতা সৃষ্টি করেননি। এ দিনের এ বক্তৃতার জন্যে তিনি নিজেকে দীর্ঘদিন ধরে তৈরী করেছেন- বাঙালিও তৈরী হয়েছে। যুদ্ধ প্রস্তুতির দিক নির্দেশনা দেবার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানকে ভয় দেখালেন, হুংকার দিলেন। পরক্ষণেই বিচক্ষণ সেনাপতির ভূমিকা থেকে সরে এসে বঙ্গবন্ধু বিদগ্ধ রাজনীতিবিদের মতো, শুদ্ধতম দেশপ্রেমিকের মতো যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার বাসনা ব্যক্ত করলেন না। একজন দক্ষ এবং গভীর দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষের মতো আলোচনার জন্যে তিনি দরজা-জানালা খোলা রাখলেন। ৭ই মার্চের টগবগে দিনেও বঙ্গবন্ধু বললেন- 'আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো- এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম- আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে, আমি যাবো। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না।'

১৯শে নভেম্বর ১৮৬৩ সালে গেটিসবার্গে আব্রাহাম লিংকন ৩ মিনিটে ২৭২টি শব্দের নিখুঁত গাঁথুনিতে একটি অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। উল্লেখযোগ্য অংশটুকু হলো 'গণতন্ত্র হলো জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা সরকার, জনগণের জন্য সরকার' (Democray is a government of the people, by the people and for the people)। দীর্ঘ দু'ঘন্টা বক্তব্য দিয়ে মূল বক্তা অ্যাডওয়ার্ড এভাস্ট বললেন, লিংকনের দু'মিনিটের বক্তৃতার কাছাকাছি যদি কিছু বলতে পারতাম তাহলে জীবন ধন্য হতো। আব্রাহাম লিংকনের বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝতে অ্যাডওয়ার্ড এভাস্ট-এর মতো ইয়াহিয়া খানের বিদ্যা-বুদ্ধি, মন-মেজাজ, রুচিবোধ কোনটাই ছিলো না। বঙ্গবন্ধু তারপরও সামরিক জান্তা ইয়াহিয়ার সাথে বসতে চেয়েছেন, আলাপ-আলোচনা করতে চেয়েছেন। ইয়াহিয়া সহ পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার সাথেও বসতে চেয়েছেন- শুধুমাত্র জনগণের জন্যে, গণতন্ত্রের জন্যে, দেশের জন্যে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের পনেরো কোটি রক্তচোখের সামনে দাঁড়িয়েও ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু আলোচনার কথা বললেন, বৈঠকে বসতে আহ্বান করলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও একজন মানুষের কথা ন্যায্য হলে তা মেনে নেবার শপথ পর্যন্ত করলেন।

শেখ মুজিব চিন্তা-চেতনা-মননে আলাদা প্রকৃতির, ভিন্নধর্মীর। প্রচলিত চিন্তার বাইরে, বিকল্প-চিন্তা করে তিনি নিজে যেমন সারা পৃথিবীতে সাহসী নেতা হিসেবে পরিচিত হলেন। ঠিক তেমনি বাঙালি জাতিকেও "বীরের জাতি" হিসেবে

বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজনৈতিক আকাশে ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু নিজেকে উপস্থাপন করেন মহাকায় হিসাবে। তাঁর সরব উপস্থিতিতে তাঁর পাশে সেসময় অন্যান্য রাজনীতিবিদদের ম্লান মনে না হলেও কখনো উজ্জ্বল মনে হয়নি। ১৯৭১ এর মার্চে শেখ মুজিব বাঙালিদের নিয়ে মেতে উঠলেন 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে'। তাঁর আদেশ-নির্দেশে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো বাঙালি ফেড়েফুড়ে বেরিয়ে পড়লো। মনে হলো বাংলার মাঠ-ঘাট কখনো সবুজ ছিলো না। বিপ্লবের তান্ডবে সব ফসল যেন লাল হয়ে উঠলো। বাংলার নদ-নদী-খাল-বিল-নালা-পুকুরে ছিলো না কোনো সুপেয় জল। জলাশয়গুলো টইটুম্বুর ছিলো শুধু চোখের নোনা জলে আর তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তে। মনে হলো বাংলা কখনো শান্ত-স্নিগ্ধ ছিলো না। সবকিছু যেনো টর্নেডোতে থরোথরো কেঁপে উঠলো। বঙ্গবন্ধু ইচ্ছে করলে বাঙালির বিস্ফারিত চোখের আগুনে পাকিস্তানী শাসন ব্যবস্থাকে পুড়িয়ে দিতে পারতেন। এক মুহূর্তের জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে দগ্ধ করতে পারতেন। টর্নেডো ঝড়ে সবকিছু তছনছ করে দিতে পারতেন। তিনি ওসব কিছু না করে ধীমান-পন্ডিতের মতো ৭ই মার্চের ভাষণে সুখ এবং শান্তির প্রত্যাশায় আলোচনার জন্যে ইয়াহিয়া সাহেবকে আমন্ত্রণ করলেন। এ যেন পরম মমতায় কুটুম বাড়িতে পরমাত্মীয়কে আমন্ত্রণ করা। কী চমৎকার ভঙ্গিমায় বঙ্গবন্ধু বললেন-

"টেলিফোনে আমার সাথে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরীবের উপরে, আমার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।"

খাদের কিনারায় দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু 'যুদ্ধযুদ্ধ' মনোভাব দেখাননি। শেষ পর্যন্তও তিনি বললেন 'আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন'। একজন দেশপ্রেমিক নেতা সহসা যুদ্ধ করতে চান না- বঙ্গবন্ধু তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তার একটি নমুনা মাত্র।

আশা-প্রত্যাশার ডানায় ভর করে বঙ্গবন্ধু সোনালী ভবিষ্যতে যেতে পরিকল্পনা করতেন। পরিকল্পনায় সবসময় বাঙালির জন্যে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি আর সৃষ্টিশীলতার

জন্যে ভাবনা থাকতো। নিজের দেশকে উজ্জ্বল করবার জন্যে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিলো সবসময়ের জন্য শতভাগ নিখাদ। তাঁর জীবন যাপনে মনে হতো স্বাধীন দেশের জন্যে সবচে' অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। মানুষের কল্যাণের জন্যে দেশ সৃষ্টি না হলে পিছিয়ে পড়তে হবে। আবার দেশের কল্যাণে দেশের মানুষকে সম্পৃক্ত করতে না পারলে সব আয়োজন ব্যর্থ হবে। সামরিক শাসন ব্যবস্থায় তা কোনোদিন সম্ভব নয়। সামরিক শাসন ব্যবস্থা মানেই 'একলা চলার নীতি'। সামরিক শাসনে গণতন্ত্র থাকে না। মানুষের মতামত, বাক স্বাধীনতা থাকে না। সামরিক শাসনে 'ভোট-গণতন্ত্র-উন্নয়ন' এর শ্লোগানে প্রহসন আর নাটকের ছড়াছড়ি। এজন্যে তিনি সামরিক শাসনকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন। সামরিক শাসনের সময় বঙ্গবন্ধু ঘৃণায়-কষ্টে ছটফট করতেন। তাঁর এই গভীর কষ্টবোধ জেগে উঠলো ৭ই মার্চের ভাষণেও। সামরিক শাসন ব্যবস্থাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করার পরও ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সামরিক জান্তাকে হুঁশিয়ার করে শান্তিপূর্ণভাবে ফায়সালা করার জন্যে অন্তরে ঘৃণা রেখেও 'ভাই' সম্বোধন করলেন।

'যদি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফায়সালা করতে পারি তাহলে অন্ততপক্ষে ভাই, ভাই হিসাবে বাস করার সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য আপনাদের অনুরোধ করছি আমার এই দেশে আপনার মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা আর করবেন না।'

'ফায়সালা' শব্দটি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে উঠে এসেছিলো। ফায়সালা তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে করতে চাননি। 'ফায়সালা' শব্দের আগে তিনি 'শান্তিপূর্ণভাবে' কথাটি উচ্চারণ করলেন। যুদ্ধে শান্তি নেই- সাধারণ মানুষের মতোই বঙ্গবন্ধু জানতেন। এজন্যে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে ফায়সালার জন্যে বসতে চেয়েছেন, আলোচনা করতে চেয়েছেন। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে চেয়েছেন। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী জানতো, আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ ফায়সালা করলে হয়তো শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু মিলিটারী শাসনতো আর থাকবে না। এজন্যে তারা পূর্ব পাকিস্তানে 'পোড়ামাটি' নীতি বাস্তবায়ন করতে সামরিক কায়দায় বর্বোরোচিত তান্ডব চালালো। ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর উচ্চারিত শব্দমালার মতো, পৃথিবীর সকল মানুষের অনন্তকালের চাওয়ার মতো 'শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফায়সালা' আর হলো না। উল্টো প্রতিষ্ঠিত হলো

'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ো'। শান্তিপূর্ণ ফায়সালা হলে আমাদের আর ঝাপিয়ে পড়তে হতো না। আমরা হারাতাম না আমাদের তিরিশ লক্ষ মানুষের অমূল্য প্রাণ। শুনতে হতো না দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম হারানোর করুণ আর্তনাদ।

তথ্যসূত্রঃ

* শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণীয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব ঃ জয়ীতা প্রকাশনী

'মুজিব' অর্থ সঠিক উত্তরদাতা

১৯৪৭ সালে বাংলার খন্ডিত অংশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নামধারণ করে অতিকষ্টে ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাসে বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু করলো। এ যেন কোন এক সংগ্রামী বিকলাঙ্গ প্রাণির পথ চলা। ছিলো না কোন গতি, ছিলো না কোন ছন্দ। এরকম অবস্থায় পূর্বপাকিস্তান নামক বিকলাঙ্গ বাংলায় বেড়ে উঠতে শুরু করলো কিছু প্রতিবাদী মানুষ। আস্তে আস্তে এই প্রতিবাদী মানুষগুলোর কণ্ঠস্বর বঞ্চিত-নিষ্পেষিত মানুষের কানে পৌছাতে শুরু করলো। ১৯৪৭-এর চেতনায় যে সমস্ত বয়স্ক রাজনীতিবিদ পুষ্ট ছিলো তারা ইতোমধ্যে আস্তে আস্তে নির্জীব হতে শুরু করলো। অপরদিকে এসময় যে সমস্ত যুবক অসম দেশ-বিভাজনে নিজেদের বঞ্চিত ভাবতে শুরু করছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উজ্জ্বল মুখ শেখ মুজিব।

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে আস্তে আস্তে তাঁর মনমতো পূর্ববাংলা তারপর বাংলাদেশ হিসাবে তৈরি করতে শুরু করলেন। তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ১৯৬২ সালের ২৫শে ডিসেম্বরের গভীর রাতের একটি সাহসী পদক্ষেপে। শেখ মুজিব পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করার জন্যে, স্বাধীন করার জন্যে সেসময় ছটফট করছিলেন। শেখ মুজিব যেনো হাজার বছরের বঞ্চনার শিকার, বেদনাকাতর কোন মানুষ। বেদনাকাতর মানুষটিকে সেবা-সাহায্য দেয়ার জন্যে হাত বাড়ালেন ইত্তেফাকের সম্পাদক মানিক মিয়া আর ভারতের প্রতিনিধি জনাব শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জী। অভিজ্ঞ সেবকের মতো মানিক মিয়া বঙ্গবন্ধুকে আগলে রাখলেন, আর শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জীকে দূত হিসেবে পাঠানো হলো রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ভারতের প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নিকট। স্বাধীনতার প্রসব বেদনায় কাতর

বঙ্গবন্ধুকে জরুরি ভিত্তিতে পন্ডিত নেহেরু কোন চিকিৎসা দেননি। কিছুদিন পর মুজিবকে তিনি রাজনীতির বিশেষজ্ঞ হিসেবে চিকিৎসাপত্র (Prescription) দিলেন। চিকিৎসাপত্রানুযায়ী বাংলার স্বাধীনতার জন্যে যথার্থ এবং কার্যকরীভাবে ভারতের সাহায্য আশা করলে মুজিবকে অবশ্যই উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হলো। মুক্তির রোডম্যাপ বাস্তবায়নে মুজিবের এখনই কোন তাড়াহুড়ো করা উচিত হবে না বলে জানিয়ে দেয়া হলো। ব্যর্থতা এড়াতে মুজিবকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হলো। মুজিবের রাজনৈতিক চিকিৎসাপত্রে (Prescription) নেহেরু আরো পরামর্শ দিয়ে বললেন, গণতন্ত্রের চেতনা প্রতিষ্ঠিত করতে গণমানুষের মধ্যে মুজিবকে আরো গণসংযোগ বাড়াতে হবে। এসব করতে মুজিবকে হয়তো অনেক চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিতে হবে। তারপরও মুজিব যেনো সে সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে ধাপে ধাপে সকল রাজনৈতিক পদক্ষেপ বাস্তবায়নের জন্যে প্রস্তুত থাকেন। মুজিব, মুজিবের মতো নিজেকে জনগণের কাছে বিকল্পহীন মুক্তিরদূত হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে ভারত অবশ্যই দেশ স্বাধীন করতে তাঁকে তাঁর প্রত্যাশানুযায়ী আর্থিক, কূটনৈতিক, রাজনৈতিক এবং মাঠ পর্যায়ে সব ধরণের নিঃশর্ত সমর্থন দেবে।

পন্ডিত নেহেরুর রাজনৈতিক চিকিৎসাপত্র পেয়ে মুজিব নতুন উদ্যমে রাজনীতির মাঠে নেমে পড়লেন। সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ দীর্ঘ নয় বছর ভারত এবং ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র মুজিবসহ মুজিবের অনুসারি এবং বাংলাদেশের জনগণকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলো। এসময় বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিকভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ সাফল্যের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন। বাংলার জনতা তাঁকে কল্পকাহিনীর হ্যামিলনের বংশীবাদক মনে করলো। মনে করলো হাজার বছর অপেক্ষার পর এই বুঝি শুরু হলো বাঙালির জেগে ওঠার পালা। এই বুঝি বেজে উঠলো সত্যিকারের মুক্তির মাদল। ১৯৭০ সালের এ রকম একটি ঘটনা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন। আনিসুল হক ঘটনাটি 'এখানে থেমো না' উপন্যাসে এভাবে উপস্থাপন করেছেনঃ-

'রেহমান সোবহান লঞ্চে উঠেছেন। বঙ্গবন্ধু যাচ্ছেন কালিগঞ্জ। তাজউদ্দীনের নির্বাচনী এলাকা। নদীর দুই ধারে মানুষ আর মানুষ। আদমজীনগরে শ্রমিকেরা এসেছে দল বেঁধে। তারা বঙ্গবন্ধুকে তাদের মধ্যে ডেকে নিল। তারা সমর্থন

জানাল শেখ সাহেবকে। রেহমান সোবহান চোখ বড় বড় করে তাকান নদীর দুদিকে। লঞ্চ যাচ্ছে আর হাজার হাজার মানুষ নদীর দুই ধারে জড়ো হয়েছে। লঞ্চের পাশাপাশি মানুষগুলো ছুটে ছুটে যাচ্ছে নদীতীর ধরে। শেখ মুজিবের এ কী আকর্ষণ?

নদীতীরে একটা জায়গায় মঞ্চ বানানো হয়েছে। মাইকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ হাত তুলে শেখ মুজিবকে ডাকছে। শেখ মুজিবের সময় নাই। এমনিতেই আদমজীর শ্রমিকদের জমায়েতে অনির্ধারিত ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন। এখন কীভাবে নদীতীরের এই স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশে তিনি যোগ দেবেন। হ্যান্ডমাইকে জানিয়ে দেওয়া হলো, "আজ আমার সময় নাই, আরেক দিন আসা যাবে"।

জনতা কথা শুনল না। তারা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শত শত মানুষ সাঁতার কেটে আসছে মুজিবের লঞ্চের দিকে। তারা মুজিবকে চায়।

শেখ মুজিব এই ভালোবাসার দাবির কাছে নতিস্বীকার করলেন। তিনি আবেগাপ্লুত চোখে তাকালেন সেই মানুষগুলোর দিকে আর ধরা গলায় বললেন, "লঞ্চ ভেড়াও। মানুষগুলো তো না হলে পানিতে ডুবেই মারা যাবে"।

রেহমান সোবহানের মনে প্রশ্ন, শেখ মুজিব না বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। বামরা না শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি। তাহলে শ্রমিকেরা কেন জীবন দিতে প্রস্তুত এই মানুষটার জন্য? আমাদের বাম বন্ধুদের এটা জিজ্ঞেস করতে হবে।

রেহমান সোবহান বলেনও বঙ্গবন্ধুকে সেই কথা। আপনার পেছনে আছে গরিব মানুষ। গরিব কৃষক, গরিব শ্রমিক। এই গরিব মানুষদের জন্য আপনাকে কাজ করতে হবে। আমাদের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অঙ্গীকার থেকে নড়া চলবে না।

"আমি সেটা জানি ডক্টর সাহেব।" শেখ মুজিব আর্দ্র চোখে তাকান। নদীর ওপরে আকাশ, আকাশে সূর্য আর মেঘের খেলা, শেখ মুজিবের চোখের চশমার কাচে সেই মেঘ-রোদ্দুরের প্রতিবিম্ব। শোনেন, "সেই '৫৪-এর ভোটের সময় গ্রামের বৃদ্ধা আমাকে তাঁর পর্ণকুটিরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ত্রিকুলে তাঁর কেউ ছিলো না। আমাকে গুড় আর মুড়ি খেতে দিয়ে আমাকে একটা সিকি দিয়ে

বলেছিলেন, "আমার যে আর কিছু নাই বাবা, এই পয়সাটা রাখো"। আমি এই মানুষরে ভুলে যাব কীভাবে?"

'লঞ্চ ভটভট করে এগিয়ে যায়। সারেং সিটি বাজায়। দুই পাশ থেকে রব আসে, জয় বাংলা।'

হাজার বছরের ঐতিহ্য বুকে নিয়ে যে বাংলা অবিরাম নিপীড়িত-নিষ্পেষিত-ভুলুণ্ঠিত, সেই বাংলা এভাবে জেগে উঠতে শুরু করলো। যে কারণে আমরা পেয়েছি ৬৯-এর গণআন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান। পেয়েছি ৭০ এর নির্বাচন এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। পেয়েছি ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। সফল মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্য ফসল হলো আমাদের স্বাধীন সোনার বাংলা।

সুদীর্ঘ নয় মাস শ্বাসরুদ্ধকর বন্দিদশা থেকে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৯ই জানুয়ারী সকাল ছ'টায় হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছেন। বঙ্গবন্ধুর ১৯৭২-এর ৯ই জানুয়ারী কয়েক ঘন্টা লন্ডনে অবস্থান, মাত্র ত্রিশ মিনিট ইন্দিরা গান্ধীর সাথে টেলিফোন সংলাপ, এবং বাংলাদেশের রাজনীতির অলিগলি-বাঁকাপথ চেনা পথিক এস্ ব্যানার্জীকে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিমানসাথি করা এই তিনটির সমষ্টিগত ফল হলো 'ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার'। বিষয় তিনটি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে পরিস্কার বোঝা যায়, একটির সাথে আরেকটির শক্ত গাঁথুনি। আলোচ্য তিনটি অনুসঙ্গের একটি অনুসঙ্গ অনুপস্থিত থাকলে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার বিলম্বিত হত। ভারতের সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাবিত তারিখ ছিলো ১৯৭২-এর ৩০শে জুন। বঙ্গবন্ধুর সরব-সাবলিল উপস্থিতি আলোচিত তিনটি অনুসঙ্গকে প্রভাবিত করে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের নির্ধারিত তারিখ থেকে তিন মাস এগোনো সম্ভব হলো। আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশে-দেশে, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে, প্রতিনিধি দ্বারা আলোচনার মাধ্যমে অনেক দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা হয়। আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা হলে সবাই নিজেকে জয়ী জয়ী মনে করে। ফলপ্রসূ আলোচনার ভিত্তিতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার- মেডিয়েশন জগতে আরেকটি সাফল্যের পালক সংযোজিত হলো।

পূর্বেই বলা হয়েছে লন্ডন থেকে দিল্লিতে আসার সময় বঙ্গবন্ধুর বিমানসাথি ছিলেন এস্ ব্যানার্জী। ইতিহাস সচেতন পাঠক মাত্রই ইতোমধ্যে জেনেছেন,

১৯৬২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর গভীর রাতে দুঃখিনী এ'বাংলায় স্বাধীনতার প্রসব বেদনা উঠেছিলো। এস্ ব্যানার্জী এদিন থেকে শেখ মুজিবকে ছায়ার মতো অনুসরণ শুরু করলো। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতবর্ষকে তিনভাগে ভাগ করার কথা ছিলো। বাংলা এবং আসাম নিয়ে গঠিত হবে পূর্ব পাকিস্তান। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, এবং সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে পশ্চিম পাকিস্তান। বাকি অংশটা হিন্দুস্তান বলে পরিচিত হবে। ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদদের বিভক্ত চিন্তা-ভাবনা অর্থাৎ নানা মুনির নানা মতকে পুঁজি করে কুটকৌশলে মাউন্টব্যাটেন র‍্যাডক্লিফকে কাজে লাগালেন। তাকে দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে জটিল মানচিত্র উপহার দিলো ভারতবাসীকে। সারা বিশ্বও দেখলো ভারতবর্ষের জটিল-দূর্ভেদ্য মানচিত্র। পুরো ভারতবর্ষ র‍্যাডক্লিফ-এর পেন্সিলের আগায় ক্ষত-বিক্ষত হলো, রক্তাক্ত হলো। র‍্যাডক্লিফের পেন্সিলে শুধু ভারতবর্ষ ভাগ হলো না, ভাগ হলো হাজার বছর ধরে গড়ে উঠা সামাজিক বন্ধন। বিশেষ করে বাংলা এবং পাঞ্জাববাসীর অশ্রু আর রক্তধারা আজও এ অঞ্চলের মানুষগুলোকে পীড়া দেয়, তীব্র কষ্টে কাঁদায়। যে শিশু পুতুল খেলতো পাশের বাড়ির শিশুটির সাথে, সে ঘুম থেকে জেগে আর কোনদিন পুতুল খেলার সাথিকে খুঁজে পায়নি। যে কৃষক আগের দিন লাঙ্গল চষেছে তার বাপ-দাদার জমিতে, সকালে ঘুম থেকে উঠে সে শুনলো ওই জমি আর তার দেশের চৌহদ্দির মধ্যে নেই। এরকম কত উদ্ভট-বিচিত্র কাহিনীর জন্ম হলো র‍্যাডক্লিফের পেন্সিলের আগায়। যার কোনো হিসেব-নিকেশের অন্ত নেই। ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ চলে যাওয়ার সময় অবশেষে ভারতবাসীকে উপহার দেয়া হলো ধর্মভিত্তিক বিভাজিত ক্ষত-বিক্ষত বিষবৃক্ষ সদৃশ দু'টি রাষ্ট্র।

১৭৫৭ সালের পর ইংরেজরা মহাদাপটে ভারতবর্ষ শাসন-শোষণ শুরু করলো। তাদের দাপটের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলো নানা ছলচাতুরী, নানা কূটকৌশল। এ পদ্ধতিগুলো ইংরেজরা সাধারণত ধর্মাচারে এবং সামাজিক রীতিনীতিতে প্রয়োগ করতো। তাদের নীতি ছিলো বিভক্তিকরণ নীতি। তারা গোষ্ঠিকে বিভক্ত করতো। সমাজ ব্যবস্থাকে বিভক্ত করতো। আবার ভাষার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অঞ্চলকেও বিভক্ত করতো। সর্বোপরি তারা ধর্মীয় অনুভূতিতে সবসময় সুড়সুড়ি দিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতো।

শোষিত-নিপীড়িত সোনার বাংলা শাসন-শোষণের পরিবর্তে সেবা দেবার মহান ব্রত নিয়ে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে প্রথমে লন্ডনে গেলেন। অতঃপর দিল্লি আসার পথেই সিদ্ধান্ত হলো সোনার বাংলা আর কেউ শাসন-শোষণ করবে না। পরম মমতায় সেবা-শুশ্রুষা দিয়ে সোনার বাংলাকে সমৃদ্ধ করা হবে। সোনার বাংলাকে সমৃদ্ধ করবার জন্যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর পরামর্শানুযায়ী সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা হবে। রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির নয়। বিমানে বঙ্গবন্ধুর পাশে বসে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধুর বিমানসাথি জনাব শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জী মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এ দায়িত্ব পালন করলেন।

মানুষের জীবন কচ্ছপের মতো দীর্ঘ নয়। মাত্র ৫২ বছর বয়সে লন্ডন থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে ঢাকা। এই স্বল্প সময়ের ভ্রমনে বঙ্গবন্ধু আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার এবং শাসন ব্যবস্থার ধরণ প্রাথমিক ভাবে ঠিক করলেন। পরবর্তীতে সমঝোতার মাধ্যমে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন তা বিশ্ব সভার ইতিহাসে বিরল। অদ্ভুত রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে চলমান পাকিস্তানী শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে ফেললেন। নতুন আঙ্গিকে সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়া সদ্য স্বাধীন দেশের ৫২ বছর বয়সি নেতার পক্ষে ছিলো সুকঠিন-কল্পনাতীত। অপরদিকে পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের চতুর্দিকে। ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে, সমঝোতার মাধ্যমে এরকম দেশের সেনা সদস্যদের এত অল্প সময়ের মধ্যে সদ্য স্বাধীন দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করাতে বঙ্গবন্ধু সফল হলেন। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে যা এখনও সমঝোতার অনন্য নজির হিসেবে উদাহরণযোগ্য। ১৯৬২ থেকে ১৯৭২। পন্ডিত নেহেরুর রাজনৈতিক চিকিৎসাপত্রানুযায়ী দশ বছরের মধ্যে 'মুজিব' মুজিবের মতো তৈরি হলেন এবং মুজিব মুজিবের মতো রাজনৈতিক ভাষায় যথার্থ উত্তর দিলেন। উত্তরটা পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু আর পেলেন না, পেয়েছিলেন তাঁর কন্যা শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী।

তথ্যসূত্র ঃ

১। ভারত, মুজিবুর রহমান, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান (অন্যান্য তথ্য) ঃ শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জী, অনুবাদ ঃ তানভীর চৌধুরী, অপরাজিতা সাহিত্য ভবন

২। এখানে থেমো না ঃ আনিসুল হক, প্রথমা প্রকাশন

শুধু বিস্কুট খেয়ে কাটালেন তাঁরা স্বাধীন দেশে দুইদিন

আজ অনেক দিন হলো ৭১ কে চোখে না দেখা প্রজন্ম পরিণত বয়সে পদার্পণ করেছে। জগৎ-সংসারে তারা কেউ কেউ এখন প্রতিভার গুণে অথবা অধ্যবসায়ের জোরে সফল-দীপ্যমান। সুন্দর পৃথিবী গড়তে সাধারণ, অসাধারণ যে অবস্থানই হোক, তাদের অবদান আজ অনস্বীকার্য। প্রযুক্তির যুগে তারা এখন কল্পনা করতে পছন্দ করে না। সবকিছু তাদের দৃশ্যমান না হলে ভালো লাগে না। তাদের বোধেও আসে না। ৭১ কে যারা চোখে দেখেনি, স্পর্শ করেনি- তারা কী কখনো ৭১-এর ভয়াবহতা কল্পনা করতে পারবে? ষোলকলা পূর্ণ করে, কল্পনার দিগন্তকে ইচ্ছে মতো ছড়িয়ে দিয়ে এখনকার প্রজন্ম কী একজন পলায়নপর, বিপন্ন, নিরন্ন, মৃত্যু-আতঙ্কগ্রস্ত গর্ভবতী মায়ের কষ্ট অনুভব করতে পারবে?

শিরায়-উপশিরায়, রক্তস্রোতে কষ্ট লালন করে বেদনার কালো কালিতে 'আমি মা' প্রবন্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জ্যেষ্ঠ কন্যা, গণতন্ত্রের মানসনেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিখেছেনঃ-

'পরের দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ আবার বাসায় আক্রমণ করে। মা রাসেলকে নিয়ে পাশের বাসায় আশ্রয় নেন। ২৫ মার্চ রাত থেকে কার্ফু ছিলো। ২৬ তারিখও কার্ফু, তবে ২৭ তারিখ বিকাল ৩-৪ ঘন্টা পর্যন্ত কার্ফু শিথিল করে। সেই সময় থেকেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আশ্রয়ের সন্ধানে আমাদের ঘুরতে হয়েছে। আর ৩২ নম্বর বাড়িটা হানাদার বাহিনী দখল করে রাখে।

প্রায় দুই মাসের মধ্যে ১৯ বার আমরা জায়গা বদল করে করে এ বাড়ি সে বাড়ি লুকিয়ে থাকি। খাওয়া দাওয়ার কোনো ঠিক নেই। আজ এখানে তো কাল ওখানে। এভাবেই দিনের পর দিন কাটে। রাতে ঘুমাবার জায়গাও নেই।

যে সময়টা সন্তান পেটে থাকলে খাবারের রুচি চলে যায় এবং অনেক কিছু খেতেও ইচ্ছে হয়, ঠিক সেই সময়টায় এই বিপর্যয়। খাবার ইচ্ছে হলেও পাব কোথায়? এই অবস্থায় দিন যাচ্ছে। মা আমাকে এ অবস্থায় ফেলে কোথাও যেতে পারছেন না। কামাল ইতোমধ্যে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চলে গেছে। আর আমরা আজ এক জায়গায় তো কাল আর এক জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছি। ঠিক এমনি অবস্থায় মগবাজারের একটা বাড়ি থেকে আমরা গ্রেফতার হলাম। আমাদের ধানমন্ডি ১৮ নং সড়কের একটা বাড়িতে এনে রাখা হলো। গোটা পরিবারের জন্য একখানা কম্বল ও একখানা চেয়ার দিয়েছিলো। রান্না, খাবার, কোনো কিছুই ছিলো না। দুপুরে আমাদের গ্রেফতার করেছে। দুপুরের খাবারও খাওয়া হয় নাই। এ অবস্থায় সারা দিন ও সারা রাত কাটাতে হয়েছিলো। যাহোক বন্দীখানায় কি অবস্থায় থাকতে হয় তা ভুক্তভোগীরাই ভালো জানে।

সেই থেকে এ অবস্থা চলছিলো। আমার সন্তান হবার যে সময় ছিলো তার থেকে চার সপ্তাহ আগেই অল্প অল্প ব্যথা শুরু হলো। আর তখনই আমাকে হাসপাতালে পাঠানো হলো। প্রায় এক সপ্তাহ এভাবেই কষ্ট পেলাম। আমি প্রসব বেদনায় ছাতরাচ্ছি আর আমার পাশে আমার মা থাকতে পারছেন না। আমার মা যখন হাসপাতালে আসতে চাইলেন তখন সরকারের পক্ষ থেকে সাফ বলে দেওয়া হলো, "আপনি হাসপাতালে গিয়ে কী করবেন? হাসপাতালে নার্স আছে, ডাক্তার আছে তারাই দেখবে। আপনি কি নার্স? না ডাক্তার? আপনি নার্সও না ডাক্তারও না। আপনি যেতে পারবেন না।" আমার মা একথা শুনে কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, "আমি মা-মেয়ের কাছে থাকতে চাই। আমার মেয়ে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে আমি তার কাছে থেকে সাহস দিতে চাই, দোয়া দিতে চাই, ভরসা দিতে চাই।"

কিন্তু মায়ের এ কান্না এ আকুতি হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে কোনো মূল্যই ছিলো না। তাদের জন্য বোধহয় উল্লাসের বিষয় ছিলো যে, এই কষ্টটা তারা আমার মাকে দিতে পেরেছে। আর আমি যতবার ব্যথা হচ্ছে 'মা-মা' বলেই কেঁদে যাচ্ছি। সাতদিন খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। এরপর জয় এলো আমার কোলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একটা সুস্থ বাচ্চা আমাকে দিয়েছেন। আমি আল্লাহর কাছে হাজার শোকর করেছি। কিন্তু যে কষ্টটা পেয়েছিলাম মাকে কাছে না পেয়ে সে কষ্টের কথা কি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব?'

ঘটনার পরম্পরায়, ধারাবাহিকতার গহীনে অবগাহন করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'স্মৃতির দখিন দুয়ার' এর লেখা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি ঃ

'এর মধ্যেই দেখলাম ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে এবং পাকসেনাদের সারেন্ডার করবার জন্য চাপ দিচ্ছে। হাবিলদারকে ঘুম থেকে তোলা হলো। সে কিছুতেই নমনীয় হবে না। আমরা সব সামনের কামরায় জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখান থেকে গেট খুব কাছে, অনেক বাকবিতন্ডার পর পাকসেনারা সারেন্ডার করতে রাজি হলো। তবে দুঘন্টা সময় চায়। আমরা ভেতর থেকে প্রতিবাদ করলাম। মেজর অশোক নেতৃত্বে ছিলেন।

তাঁকে চিৎকার করে বললাম, ওদের যদি দু'ঘন্টা সময় দেওয়া হয় তাহলে ওরা আমাদের হত্যা করবে। কাজেই ওরা যেন কিছুতেই চলে না যায়। আমাদের অনুরোধে ওরা ওদের অবস্থান নিয়ে থাকল এবং পাক-সেনাদের আধঘন্টা সময় দিলো।'

এই যে দু'পক্ষের সারেন্ডারের সময় নিয়ে টানাটানি। পাকিস্তানি সেনারা সারেন্ডারের জন্যে দু'ঘন্টা সময় চাইলো। অপরদিকে বন্দি পরিবারের সদস্য শেখ হাসিনার ভয়ে-আর্তনাদে, ডাক-চিৎকারে ভারতীয় মেজর অশোকের মধ্যস্থতায় দু'ঘন্টাকে কমিয়ে আধাঘন্টায় আনা হল- এটাই হচ্ছে মেডিয়েশনের সুপ্ত ধারণা। এটাই হচ্ছে সময়ের এক ফোঁড়, অসময়ের দশ ফোঁড়। এটাই হচ্ছে মেডিয়েশনের সুবিস্তৃত দিগন্ত।

বিষয়টি একটু পরিষ্কার করার জন্যে বলা যায়, পাকসেনারা সারেন্ডার করতে দু'ঘন্টা সময় চেয়েছিলো। আপসে নয়, চিৎকার-প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা মেজর অশোককে জানালেন তাঁদের জীবন এদের কাছে নিরাপদ নয়। দু'ঘন্টা সময় পেলে পাকিস্তানী সেনারা তাঁদের হত্যা করবে। পাকিস্তানী সেনাসদস্যরা থাকাবস্থায় মেজর অশোক যেন তাঁদেরকে ছেড়ে কোথাও চলে না যান। মেজর অশোক প্রজ্ঞাদীপ্ত বুদ্ধিমত্তায় সেদিন বঙ্গবন্ধু পরিবারের বন্দিসদস্যদের উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। উদ্ধার ঘটনায় তিনটি পক্ষ ছিলো।

প্রথম পক্ষ, বঙ্গবন্ধু পরিবারের বন্দিসদস্যরা- যারা নয় মাস বন্দিজীবনে প্রায় না খেয়ে মেঝেতে শয্যা পেতে থাকতেন আর মৃত্যুর প্রহর গুনতেন। দ্বিতীয় পক্ষ, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি অংশ- যারা ইতোমধ্যে বর্বরোচিত নৃশংসতায় কারবালাকে হার মানিয়েছে। তৃতীয় পক্ষ, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৪ গার্ডস ইউনিট কোম্পানি কমান্ডার মেজর অশোক কুমারসহ তিনজন সৈন্য।

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের দুইদিন পর ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১-এ মেজর অশোক বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের বন্দিবাড়ির কাছাকাছি পৌঁছুতেই বাড়ির ভিতর থেকে পাকিস্তানী সেনাসদস্য তাঁকে গুলি করার হুমকি দিলে তিনি ভয় না পেয়ে অকল্পনীয় সাহসে তাঁর এক সেনার কাছে হাতিয়ার রেখে নিরস্ত্র অবস্থায় বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। বাড়ির ভিতর থেকে আবারও হুমকি আসে মেশিনগানের নল তাঁর দিকে তাক করা আছে বলে। সে যেন আর সামনে না এগোয়। বুদ্ধিদীপ্ত মেজর অশোক কৌশলে ভিতরের সৈনিকদের সাথে কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে পাক বাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্র করেন। সাধারণ পোশাক পড়িয়ে তাদের ভিতরে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু পরিবারের বন্দিসদস্যদের উদ্ধারে মেজর অশোক সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়টি। বাড়িতে প্রবেশ করে মেজর অশোক বিস্ময়ের চোখে দেখলেন নবজাতক শিশু সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সদ্যপ্রসূতি মা শেখ হাসিনা মেঝেতে বিছানা পেতে আছেন। বন্দিদের চোখে-মুখে অজানা আতংক। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তাদের ভাবনায় তখন শুধু প্রিয়জনের ভাবনা। তাদের অস্তিত্বে বারবার প্রশ্ন জাগছে বঙ্গবন্ধু কী বেঁচে আছেন? কামাল-জামাল কী কখনো হাসিমুখে তাদের আলিঙ্গন করবে? শেখ নাসের, শেখ মনি কী সফলতার উপঢৌকন নিয়ে স্বাধীন দেশে স্বজনের কাছে হাসিমুখে ফিরে আসবে? অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনসহ চেনা-অচেনার জন্যেও তাঁরা ছিলেন দুশ্চিন্তায় বিভোর। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের নিকট থেকে মেজর অশোক সবচেয়ে কষ্টের খবর জানলেন তাঁদের কোন খাবার নেই। সদ্য স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার প্রথম দুইদিন তাঁরা ছিলেন বুভুক্ষু। তাঁদের তেমন কোন খাবার ছিলো না। নিদারুণ ক্ষুধা নিবারণের জন্যে তাঁরা কেউ কেউ শুধু বিস্কুট খেয়ে কাটিয়েছেন দুই দিন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেদিন শেখ হাসিনার আর্তনাদ আর প্রতিবাদে সাড়া না দিলে ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশে তাঁর পরিবারের সদস্যদের হয়তো জীবিত পেতেন না। আমরাও পেতাম না বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আনন্দ-উল্লাস মাখা মুহূর্ত। আজ আমরা পেতাম না গণতন্ত্রের মানসনেত্রী শেখ হাসিনাকে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এদেশে নেমে এসেছিলো রাজনীতির আকাশে অন্ধকার-অমানিশা। নেমে এসেছিলো জনজীবনে অনিঃশেষ দীর্ঘশ্বাস। দীর্ঘবন্ধ্যার পর আলোকবর্তিকা শেখ হাসিনা দেশ সেবার দায়িত্ব না পেলে আজ এদেশ কখনো উন্নয়নের মহাসড়কে পৌঁছাতে পারত না। ভাগ্য ভালো মেজর অশোক সেদিন মেডিয়েটরের দ্যুতি ছড়িয়ে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় পক্ষ, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সদস্যরা- যারা পরবর্তীতে তাদের স্বদেশে স্বজনের কাছে ফিরে যেতে পেরেছিলো। এখানে তিনটি পক্ষই তাদের অবস্থানে সফল। সমঝোতার কারণে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু পরিবারের বন্দি সদস্যরা স্বপ্নের স্বাধীন দেশে মুক্ত আলো-বাতাসে নির্ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১৪ গার্ডস ইউনিট কোম্পানী কমান্ডার মেজর অশোক কুমার সহ তিনজন সদস্যের প্রজ্ঞাদীপ্ত ভূমিকা আজ অনেক প্রশংসার দাবিদার। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চায়ের আড্ডায় তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়। যে আলোচনা-সমালোচনায় আমরা প্রথম পক্ষও অংশগ্রহণ করি। গৌরব অনুভব করি।

তথ্যসূত্র ঃ

* শেখ হাসিনা, রচনা সমগ্র (১)(২), মাওলা ব্রাদার্স
* শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় স্মরণীয় বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, ঢাকা মহানগর উত্তর, পৃঃ ৩২

আমার সোনার বাংলা

৭ই মার্চের ভাষণে পাকিস্তানী দর্পী শাসকের বুক আশঙ্কার সুনামিতে ভেসে যাওয়ার ফলে ২৫ই মার্চের ভয়াল-কালো রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হলো। দীর্ঘ ন'মাস পাকিস্তানের অন্ধকার কারাগারে মৃত্যুর সঙ্গে মিতালি করে বঙ্গবন্ধু মুক্তির প্রহর গুনছিলেন আর বন্ধুরাষ্ট্র ভারত যেন তাদের প্রতিশ্রুতিনুযায়ী সাহায্য করে- সেই প্রার্থনা বিধাতার কাছে করছিলেন। আর সে মোতাবেক ভাবনা চিন্তা করে কৌশলও ঠিক করছিলেন। বন্দি মুজিব সবসময় বিশ্বাস করতেন তাঁর সোনার বাংলা একদিন স্বাধীন হবে। বাংলা স্বাধীন হলে করণীয় কি তা ঠিক করার জন্য তাঁর বিশাল হৃদয় ছিলো সবসময় উদ্বেলিত, চিন্তাযুক্ত। স্বাধীনতা অর্জিত হলে তা যেন বিফলে না যায়- তা নিয়ে তাঁর নিখুঁত কর্ম পরিকল্পনা সবসময়ই থাকতো। পরিকল্পনাগুলো সোনার বাংলায় জুতসই হবে কিনা তা পরখ করার জন্যে প্রায়শই তাঁর উর্বর মস্তিস্কে প্রদর্শনীমূলক চাষাবাদ করতেন। পরিকল্পনার কিছু পুষ্ট ফসল সংগোপনে তাঁর সুপ্ত হৃদয়ে সযত্নে রেখে দিতেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, ভৌগোলিক সীমারেখার কারণে ভারত বাংলাদেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র। স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ পেতে হলে অবশ্যই ভারতের সাথে আলোচনা করতে হবে। দু'দেশের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। সোনার বাংলার কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জনের অনেক আগে বঙ্গবন্ধু ভেবে রেখেছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ভারতের সাহায্য ছাড়া এগোনো সম্ভব নয়। বন্দি মুজিবের শ্বাস-প্রশ্বাসে ছিলো তাঁর সোনার

বাংলার প্রতিবাদী মানুষগুলো কিভাবে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হতে লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে- তার ইতিহাস। লন্ডন থেকে স্বদেশে আগমনের পথে তাঁর চিন্তা-চেতনার প্রতিটি কোষ পরিপূর্ণ ছিলো সদ্য স্বাধীন দেশের সংগ্রামী মানুষের উজ্জ্বল মুখের ছবিতে। তাঁর ধমনিতে প্রবাহিত হয়েছিল অতি আপন স্বজনদের প্রিয় মুখ। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যেন পুনরায় বিপন্ন না হয়, বিতর্কিত না হয়, নতুন কোন সমস্যার জালে আটকে না যায় সেই ভাবনায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীন দেশে না এসে, আগে দিল্লী গেলেন।

বন্ধুরাষ্ট্র ভারত বাংলাদেশ থেকে দ্রুত সেনা প্রত্যাহার করতে যেন অনুপ্রাণিত হয় সেজন্যে বঙ্গবন্ধু কূটনৈতিক আলোচনার পথ খোলা রাখতে সমস্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। সাইপ্রাস থেকে জ্বালানী নিয়ে বিমান ওমানে নেমে দ্বিতীয়বার জ্বালানী নিয়ে দিল্লির দিকে যাত্রা শুরু করলে বঙ্গবন্ধু খোশমেজাজে ভ্রমনসাথি এস্ ব্যানার্জীকে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কণ্ঠ মিলাতে বললেন। এস্ ব্যানার্জী বিস্ময়ে দেখলেন বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে দরাজ গলায় গাইতে শুরু করলেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। প্রথমবারের গাওয়া অনেকটা রিহার্সেলের মতো মনে হলো। দ্বিতীয়বার অশ্রুসিক্ত নয়নে বঙ্গবন্ধু দরাজ-আবেগি গলায় গানটি গাওয়া শুরু করলে এস্ ব্যানার্জীও তাতে কণ্ঠ লাগালেন। বঙ্গবন্ধু কোনরকম ভণিতা না করে এস্ ব্যানার্জীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি আমার দেশের জাতীয় সঙ্গীত হওয়া উচিত কিনা? এস্ ব্যানার্জী এই গানটি জাতীয় সঙ্গীত হলে ভারতের সঙ্গে মৈত্রীসেতু তৈরি করতে তার সহায়ক শক্তি হবে বলে মতামত দেন। যুক্তিতে তিনি হয়তো উপস্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। আবার একই ব্যক্তির অন্য আরেকটি গান যদি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচিত হয় তাহলে ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো গভীর হবে। ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অতীতের মতো বর্তমানেও সচল হবে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের জন্ম-মৃত্যুর ব্যপ্তিকাল অবিভক্ত ভারতে। এস্ ব্যানার্জীর যুক্তিতে বঙ্গবন্ধু পুলকিত এবং উৎফুল্ল হলেন। তিনি বললেন 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত করার সিদ্ধান্ত দুই পুরনো বন্ধুর নেয়া, 'আপনি এবং আমি- রয়্যাল

এয়ার ফোর্সের লন্ডন থেকে ঢাকাগামী ফ্লাইটে তা হয়তো ইতিহাসের কোথাও লিখিত রেকর্ড থাকবে না'।

লন্ডন থেকে ঢাকাগামী ফ্লাইটে চিন্তার জগতে শত শত চিন্তা ভিড় করলেও বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য চিন্তা ছিলো বাংলাদেশ থেকে যত দ্রুত সম্ভব ভারতের সেনা প্রত্যাহারের বিষয়। সেজন্যে তিনি তাঁর ভ্রমণসাথি এস্ ব্যানার্জীকে মেডিয়েটরের ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিলেন। এস্ ব্যানার্জীকে মেডিয়েটরের ভুমিকায় আনতে উৎসাহিত করার জন্যেই বঙ্গবন্ধু বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে একসাথে দাঁড়িয়ে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গাইতে অনুরোধ করেছিলেন। স্বাধীনতাহীনতায় বাংলাদেশ যেন আবার পতিত না হয় সেজন্য বঙ্গবন্ধু এস্ ব্যানার্জীকে নানা কৌশলে, নানা উপায়ে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। ব্যানার্জী যেন ইন্দিরাজীকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে বলতে পারেন ১৯৭২-এর ৩১ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতের সেনা প্রত্যাহার করা উচিত। বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে ঢাকাগামী বিমানপথে এক সেকেন্ড সময়ও অপচয় করেননি। তিনি এই সময়টুকু পরিপূর্ণ কাজে লাগিয়েছিলেন। সদ্য স্বাধীন দেশের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করে সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কিনা তা তিনি বারবার ভেবে নির্ধারণ করেছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরে যেসব সমস্যা ইতোমধ্যে সৃষ্ট হয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে তা নিরসনে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আইনি পথে যেতে হবে আবার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে আপস-নিষ্পত্তি করা যাবে সেবিষয়গুলোও তিনি ভেবে রেখেছিলেন। এজন্যেই আমরা দেখতে পাই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ এর ১০ই জানুয়ারী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরপর রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন করেছিলেন। দেখতে পাই, বঙ্গবন্ধু ১০ তারিখে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন দেশ বাংলাদেশে আগমন করলেও ১৪ই জানুয়ারী ১৯৭২-এ তিনি হয়ে যান সংসদীয় পদ্ধতিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। সবকিছুই সম্ভব হয়েছিলো পাকিস্তানের অন্ধকার কারাগারে বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘ নয় মাস সময়কালের চিন্তা এবং লন্ডন থেকে ঢাকাগামী বিমানপথে ইন্দিরাজীর প্রতিনিধি এস্ ব্যানার্জীর সাথে তা আদান প্রদান করার কারণে। বিমানপথে বঙ্গবন্ধু এবং ভারত প্রতিনিধি আলোচনার একটি উর্বর ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলে পরবর্তীতে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ইতিবাচক-প্রীতিময় অনেক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছিলো।

পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক প্রত্যাশা ছিলো বঙ্গবন্ধু যেন দিল্লি থেকে ঢাকা যাবার পথে একটু সময়ের জন্যে কলকাতার মাটি স্পর্শ করেন। কলকাতার মাটিকে ধন্য করেন। কিন্তু স্বদেশে স্বজনদের না দেখে বঙ্গবন্ধু আর এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করতে পারছিলেন না। দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে বাঁধভাঙ্গা আবেগ যেন জোয়ারের ঢেউয়ের মতো তাঁকে প্লাবিত করছিল। বিনয়ের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রীকে বঙ্গবন্ধু অনুনয় করে বলেছিলেন, এবারের মতো তাঁকে যেন ক্ষমা করা হয়। তিনি তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন সোনার বাংলায় স্বজনদের কাছে দ্রুত ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। যত দ্রুত সম্ভব মূখ্যমন্ত্রীর আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু কলকাতায় আসবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কয়েকদিন পর বঙ্গবন্ধু পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের আমন্ত্রণে কলকাতায় এলেন। লাখ লাখ মানুষ কলকাতার রাস্তায় নেমে এলো বঙ্গবন্ধুকে একনজর দেখার জন্যে। কলকাতাবাসী বিশ্বাস করতেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নে দেখা কোনো বন্ধু নয়, বঙ্গবন্ধু হলেন সময়ের বাস্তবতায় তিলে তিলে গড়ে উঠা প্রকৃত বন্ধু। সেদিন কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে বঙ্গবন্ধুর আবেগমথিত কণ্ঠে সম্মোহনী বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ শুনেছিলো। 'বঙ্গবন্ধুর জনসভায় প্রায় দশ লক্ষ মানুষের ঢল' শিরোনামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত পত্রিকা পরেরদিন সংবাদ পরিবেশন করেছিলো। মুজিবের বক্তব্য শুনতে দিল্লি থেকে কলকাতায় উড়ে এসেছিলেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। মুজিবের বক্তব্যে অবাক-মুগ্ধ ইন্দিরাজী বললেন, মুজিব তাঁর বাড়ি ফিরে এত দ্রুত কলকাতা শহরে এসেছেন এজন্যেও তিনি মুগ্ধ। এত দ্রুত কলকাতায় আসার জন্যে তিনি বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

কলকাতার রাজভবনে আলোচনায় প্রধান বিষয় ছিলো বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার। সদ্য স্বাধীন সোনার বাংলার স্থপতি প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে সৈন্য প্রত্যাহার নিয়ে যে কথোপকথন হয়েছিলো তা আজও সারাবিশ্বের কাছে বিস্ময়। তাঁদের কথোপকথনে ছিলো দু'দেশের জন্যে অফুরন্ত আলোর সন্ধান। তাঁদের আলোচনায় বাংলাদেশ-ভারতের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতকে হাতছানি দিয়েছিলো বলেই কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলোঃ-

'শেখ মুজিব ঃ মাদাম, আপনি কবে নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করবেন?

ইন্দিরা গান্ধীঃ বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তো এখন পর্যন্ত নাজুক পর্যায়ে আছে। পুরো সিচুয়েশন বাংলাদেশ সরকারের কন্ট্রোলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? অবশ্য আপনি যেভাবে বলবেন সেটাই করা হবে।

শেখ মুজিব ঃ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রায় ত্রিশ লাখ লোক আত্মাহুতি দিয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে আইন ও শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতির জন্য আরো যদি দশ লাখ লোকের মৃত্যু হয় আমি সে অবস্থাটা বরদাশত করতে রাজি আছি। কিন্তু আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই বলছি, বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

ইন্দিরা গান্ধী ঃ এক্সেলেন্সি, আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে আগামী ১৭ই মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে।

শেখ মুজিব বললেন, মাদাম কেন এই বিশেষ দিন ১৭ মার্চের কথা বললেন?

ইন্দিরা গান্ধী ঃ এক্সেলেন্সি, প্রাইমমিনিষ্টার, ১৭ই মার্চ হচ্ছে আপনার জন্মদিন।'

গর্বের সাথে বলা যায়, ১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চেই ভারতের সৈন্যদের শেষ দলটিও স্বাধীন বাংলার শহিদের রক্তস্নাত পবিত্র মাটি থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলো ভারত সরকার। জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুর জীবনে এটি ছিলো শ্রেষ্ঠতম উপঢৌকন-পুরস্কার।

১৭৫৭ সালের পর এদেশবাসির কাছে সবচেয়ে আনন্দের, উৎফুল্লের এবং অহংকারের দিন ছিলো বাংলার মাটি থেকে ভারতের সেনা প্রত্যাহারের দিন। এ দিনটির জন্যেই এ বাংলায় এসেছে ১৭৫৭, ১৮৫৭, ১৯০৫, ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৬৯, এবং ১৯৭১ সহ আরও কতো হীরকোজ্জ্বল মুহূর্ত। স্বাধীনতা হারিয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্যে পাগলপ্রায় জাতিকে দীর্ঘ ২১৫ বছর অপেক্ষা করতে

হলো। দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহরে বাংলার উর্বর পলিমাটিতে আত্মাহুতি দিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদদ্দৌলা, মীর মদন, মোহন লাল, খুদিরাম, ফকির মজনু শাহ, বাঘা যতিন, তিতুমীর, মাষ্টার দা সূর্যসেন, প্রীতিলতা, সালাম, বরকত, শফিক, ডঃ জোহাসহ ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি। আরো দুই লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনের করুণ আর্তনাদের বোবা সাক্ষী হলো এবাংলার আকাশ-বাতাস।

ভারতীয় সেনা ১৭ই মার্চ ১৯৭২ এর মধ্যে ফিরে না গেলে এ বাংলায় আবার হয়তো অন্ধকার নেমে আসতো। অনেক ঋণে কেনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আবার বিপন্ন হত। এ বিপন্ন-অন্ধকার কতদিন, কত বছর, কতযুগ এবাংলার আকাশে ভেসে বেড়াত তা গাণিতিক হিসাবে বলা সম্ভব নয়। ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধকে সর্বোচ্চ ত্যাগের মহিমায় বরণ করে নিলেও ভারতীয় সেনাবাহিনী বিনাবাচ্যে ভারতে ফিরে গেছে এটিও বাঙালির ভাগ্যাকাশে মেঘমুক্ত হওয়ার আরেকটি সফলতা। আরেকটি দেদীপ্যমান সূর্য।

কূটনৈতিক জগতেও বিদ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে আলোচনার মাধ্যমে যে সমাধান করা যায়, আপস করা যায়, এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো। বিমান ভ্রমনের সময় বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন উজ্জীবিত করার জন্যে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিনিধি শশাঙ্ককে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু শশাঙ্ককে বোঝালেন ভৌগোলিক বিভাজনে সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি কখনো বিনষ্ট হয় না। ভৌগোলিক বিভাজনকে অভিন্ন সংস্কৃতির সুতায় অভিন্ন সূচ দিয়ে গাঁথলে আর কোন বিভেদের দেয়াল থাকে না। কৌশলে বঙ্গবন্ধু ভারতবর্ষের সবচেয়ে সফল ভৌগোলিক সন্তান রবীন্দ্রনাথকে বেছে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়ে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে প্রীতিময় সম্পর্ককে আরো প্রগাঢ় করলেন। একটি গান পাশাপাশি দুটি দেশকে কি অপূর্ব আবেগে স্পর্শ করতে পারে তা সাদা চোখে দেখা না গেলেও দুইদেশের মানুষের অনুভূতির মর্মমূলকে আলোড়িত করেছিল। ভারত সরকার তাদের সেনা বাংলার মাটি থেকে অনেক কারণে প্রত্যাহার করতে পারে। তবে সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে রবিঠাকুরের এই

গানটি একটু হলেও মেডিয়টরের ভূমিকা পালন করেছিলো তা হলফ করে বলা যায়।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম বাঙালি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ব সৃষ্টি 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানের সুরে সুরে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিলো। ভারতীয় সেনাবাহিনী এদিন চিরদিনের জন্যে বাংলার মাটি ছেড়ে চলে গেলো। আলোচনা যে কত মধুর হতে পারে- বিশ্ববাসী তা আর একবার অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখলো।

তথ্যসূত্রঃ

১. ভারত, মুজিবুর রহমান, বাঙলাদেশের স্বাধীনতা ও পাকিস্তান (অন্যান্য তথ্য)ঃ শশাঙ্ক এস্ ব্যানার্জী, অনুবাদঃ তানভীর চৌধুরিঃ অপরাজিতা সাহিত্য ভবন, পৃঃ ১৭৫

২. বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়ক, কবির চৌধুরি সম্পাদিত, অন্বেষা প্রকাশন, পৃঃ ২২

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্যে কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়

বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পররাষ্ট্রনীতিতে বঙ্গবন্ধু খুবই দূরদর্শী, সাহসী, এবং উন্নত রুচিবোধের পরিচয় দিতেন। শব্দচয়নে ছিলেন সুনিপুণ কারিগর। শব্দভান্ডার থেকে জুতসই শব্দ পছন্দ করতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। কবির মতো কল্পবিলাসী না থেকে জীবনবোধে রচনা করতেন কবিতার রাজনীতি। যে কোন পরিবেশে তাঁর সুন্দর শব্দচয়নের কথামালা এবং উপমা স্বদেশ-স্বজাতি-স্বভাষার স্বার্থ রক্ষায় অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। দীর্ঘ নয় মাস 'ফেরাউনের জিন্দাখানায়' মৃত্যুর প্রহর গুনতে গুনতে স্বাধীন দেশে স্বজন-স্বজাতির কাছে ফিরে আসার তীব্র আকুতিতে কাতর বঙ্গবন্ধু। বিহ্বল-টগবগে বঙ্গবন্ধু বিপন্ন-অস্থির অবস্থাতেও পৃথিবীর শব্দভান্ডার থেকে কিছু শব্দচয়ন করে পররাষ্ট্রনীতি করলেন সমৃদ্ধ। শতভাগ নিয়ম-কানুন মেনে অশ্রুতপূর্ব একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তিনি দিলেন ইংরেজীতে। শ্রোতা হলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। সবার আগে স্বাধীন দেশে ফিরে আসতে হবে এমন অভিলাষী বিশ্বাসে নয়, বিশুদ্ধ চিন্তার জগৎ থেকে বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ দিলেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে। বক্তব্যটি তাঁর জীবনের সেরা বক্তব্যের একটি। এ বক্তব্য দিয়ে স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রতে বঙ্গবন্ধু তাঁর আলোকজ্জ্বল আগমনের অনুপম আভাস দিলেন। বক্তব্যটিঃ

"আমার জন্যে এটা পরম সন্তোষের মুহূর্ত। বাংলাদেশ যাবার পথে আমি আপনাদের মহতী দেশের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত

নিয়েছি এ কারণে যে, আমাদের জনগণের সবচেয়ে বড় বন্ধু ভারতের জনগণ এবং আপনাদের মহীয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী- যিনি কেবল মানুষের নয় মানবতারও নেতা, তাঁর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারের কাছে এর মাধ্যমে আমি আমার ন্যূনতম ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারব। এ অভিযাত্রা সমাপ্ত করতে আপনারা সবাই নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং বীরোচিত ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায় অভিযাত্রা। অবশেষে আমি নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমার দেশের মানুষ শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাকে যখন আমার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিলো, তখন তারা কেঁদেছিলো; আমাকে যখন বন্দি করে রাখা হয়েছিলো, তখন তারা যুদ্ধ করেছিলো আর আজ যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তখন তারা বিজয়ী। আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের নিযুত বিজয়ী হাসির রৌদ্রকরে। আমাদের বিজয়কে শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার যে বিরাট কাজ এখন আমাদের সামনে তাতে যোগ দেয়ার জন্যে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার মানুষের কাছে।

আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্যে কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এ পরিতৃপ্তি নিয়ে যে অবশেষে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, অপ্রকৃতিস্থতার বিরুদ্ধে প্রকৃতিস্থতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসীকতার, অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে। জয় বাংলা! জয় হিন্দ!" (ইংরেজি বক্তব্য থেকে অনূদিত)।

বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের-স্বাধীন সোনার বাংলায় না এসে প্রথমে গেলেন বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতে। রাজনীতির কবি বঙ্গবন্ধু ভাল করেই রাজনীতি বুঝতেন। ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে অপূর্ব দূরদর্শীতায় স্বভাবসূলভ ভঙ্গিমায় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ চেতনা, মূল্যবোধ, আদর্শ, উদ্দেশ্য, লক্ষ্যস্থির করে বললেন, 'অবিচারের বিরুদ্ধে সুবিচারের এবং অশুভের বিরুদ্ধে শুভের বিজয় হয়েছে'। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বে স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি শুভ সুন্দরের সূচনা করতে চেয়েছিলেন। প্রতিহিংসা-বিদ্বেষ দিয়ে কোন দেশ শাসন করা যায় না। দেশ এবং দেশের

মানুষকে ভালোবাসা-প্রীতি-দয়া-মায়া-মমতা দিয়ে জয় করতে হয়- বঙ্গবন্ধু তা বিশ্বাস করতেন।

কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার উত্তাল তরঙ্গে বঙ্গবন্ধু দিল্লির পালাম বিমানবন্দরের ভাষণের প্রতিধ্বনি করলেনঃ-

'বাংলায় যে লোকেরা আছে, অন্য দেশের লোক, পশ্চিম পাকিস্তানের লোক, বাংলায় কথা বলে না। আজও বলছি তোমরা বাঙালি হয়ে যাও। আর আমরা আমার ভাইদের বলছি, তাদের উপর হাত তুলো না। আমরা মানুষ। মানুষ ভালোবাসি। তবে যারা দালালি করেছে, যারা আমার লোকদের ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার হবে এবং শাস্তি হবে। আপনারা, আমি দেখায় দিবার চাই দুনিয়ার কাছে যে শান্তিপূর্ণ বাঙালি রক্ত দিতে জানে, শান্তিপূর্ণ বাঙালি শান্তি বজায় রাখতেও জানে।'

এরপর বঙ্গবন্ধু অনেক কথা বললেন। প্রাণপ্রিয় বাঙালিকে পেয়ে তাঁর অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করলো। বন্দি মুজিব দীর্ঘ নয় মাসের প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর সূচ দিয়ে জীবনের উপর সেলাই করেছেন তাঁর অনেক কষ্ট, বেদনা, আকুতি, হাহাকার, ভালোবাসা, দায়িত্ব, ক্ষমা আর অনাকাঙ্খিত আশংকা। বক্তৃতার মাঝে বঙ্গবন্ধু কয়েকবার বললেন- "আজ আমি আর বক্তৃতা করতে পারছি না।' দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী, দীর্ঘ ভ্রমন তাঁকে ক্লান্ত-অবসন্ন করলেও তিনি তাঁর প্রিয় বাঙালিকে পেয়ে অন্তরের সমস্ত আকুতি ঢেলে দিলেন। আবেগে তাঁর কণ্ঠ থেকে থেকে রুদ্ধ হলেও শব্দচয়নে এবং তথ্য-উপাত্ত ঠিক রেখে বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতার শুরুতে মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহিদ হয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন। স্মরণ করলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সহ তাঁর দেশের সামরিক বাহিনী এবং সাধারণ জনগণকে- যারা অশেষ কষ্ট সহ্য করে মুক্তিকামি মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রদ্ধাভরেস্মরণ করলেন দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানি আর ইজ্জৎ হারানোর আর্তনাদ। নিজস্ব ভঙ্গিমায় তিনি কবির মতো আবেগমিশ্রিত ভাষায় অনেক কথা বললেন। দূরদর্শী নেতার মতো জনগণকে আশ্বাসের কথা শোনালেন। জাতির জনকের মতো অনেক দিকনির্দেশনা দিলেন। বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে এসে বন্ধুর মতো, ভাইয়ের মতো বলে উঠলেন, 'ভায়েরা আমার, আমার চার লক্ষ বাঙালি আছে পশ্চিম পাকিস্তানে'।

বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২-এ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে ঢাকার রেসকোর্স মাঠে আরো বললেন, 'আমার বাংলা থেকে ১ কোটি লোক মাতৃভূমি ত্যাগ করে ভারতে স্থান নিয়েছিল। কত লোক সেখানে অসুস্থ অবস্থায় মারা গেছে, কত লোক সেখানে না খেয়ে কষ্ট পেয়েছে। কত লোকের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে এই পাষন্ডের দল। ক্ষমা কোরো আমার ভাইয়েরা ক্ষমা করো। আজ আমার কারও বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেই। একটা মানুষকে তোমরা কিছু বলো না। অন্যায় যে করেছে তাকে সাজা দেবো। আইন শৃঙ্খলা তোমাদের হাতে তুলে নিও না।'

পাকিস্তানে বন্দি চার লাখ বাঙালির জন্যে বঙ্গবন্ধুর দুশ্চিন্তা এবং বাংলাদেশে বন্দি পাকিস্তানী সেনা সদস্যসহ তাদের দোসরদের বিচারের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সুস্পষ্ট অবস্থান বুঝতে পারলো পাকিস্তান। সুযোগ বুঝে পাকিস্তান সরকার আরো ষোল হাজার বাঙালি সরকারী কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করলো এবং ২০৩ জন বাঙালি কর্মকর্তাকে জিম্মি করে বাংলাদেশে বন্দি ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে তুললো। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশী বন্দিদের পাকিস্তান ত্যাগের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো। অনেক বাঙালি কর্মকর্তাকে ক্যাম্পে আটক করে বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসা করলো। বাংলাদেশ সরকারও আনুষ্ঠানিকভাবে তার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানায়। বাংলাদেশকে চাপে রাখতে পাকিস্তান অবশেষে বাঙালিদের ধরিয়ে দেবার জন্যে মাথা পিছু এক হাজার রুপি পুরস্কার ঘোষণা করলো।

পাকিস্তান একটার পর একটা হুমকি-ধামকি দিয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে বিপাকে ফেলতে হন্যে হয়ে উঠলো। পাকিস্তান আরো ঘোষণা করলো বাংলাদেশে আটক পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলে একই রকম ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি করে পাকিস্তানে আটক বাংলাদেশীদের বিচার করা হবে। প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়ে ভুট্টো যুক্তি দেখালো পাকিস্তানীরা বিশ্বাস করে যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙালিরা অবস্থান করে তথ্য পাচার করেছে এবং এই অপরাধে তাদের বিচার হওয়া উচিত। ভুট্টো আরো বললো, পাকিস্তানী জনগণ বাঙালিদের বিচার করার দাবী তুলেছে। পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীদের যদি সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার করা হয় তাহলে বাঙালিদের বিরুদ্ধেও

সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিচার করা হবে। মোদ্দাকথা, ৭১-এর পরাজয়ে ভুট্টো টালমাটাল হয়ে আটকে পড়া বাঙালিদের জিঘাংসার আগুনে বিচার করতে উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করলো। বাংলাদেশের ওপর চাপ বাড়াতে নির্লজ্জভাবে ১৯৭৩ সালে 'পাকিস্তানের সংসদ' স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে "পূর্ব পাকিস্তান" প্রদেশ হিসেবে উল্লেখ করলো।

১৯৭২ সালে ৭ই জুন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে পরাজিত কুটিল-জটিল রাজনীতি বিদ্যার পারদর্শী, সুস্থধারার রাজনীতির ব্যাকরণে অজ্ঞ ভূট্টোকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

"আর একটা কথা বলি। ভুট্টো সাহেব নারাজ হয়ে গেছেন। তিনি আবোল-তাবোল বকছেন এবং আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য আকুলিবিকুলি করছেন। আমি বলেছি, বাংলাদেশকে স্বীকার করে নিন। তারপর এসব বিবেচনা করে দেখব। তিনি এর মধ্যে আমার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছেন। তিনি একটু ভয় পেয়ে গেছেন নাকি? যারা আমার মা-বোনের ওপর অত্যাচার করেছে, যারা পশুর মতো আমার জনসাধারণকে হত্যা করেছে, যারা নিরপরাধ কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রকে হত্যা করেছে, তাদের বিচার করলে নাকি তিনি বড় অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু ভুট্টো সাহেব, শুনে রাখুন, তাদের বিচার বাংলার বুকে অবশ্যই হবে।

ভুট্টো সাহেব আমার ৪ লাখ বাঙালিকে আটকে রেখেছেন। তারা নিরপরাধ, কিছুই করে নাই। তবু তিনি দরকষাকষি করছেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি আমার বাঙালিদের ইনশাল্লাহ্ বাংলার বুকে ফেরত আনব। তিনি ঠেকাতে পারবেন না।

তবে, একটা অনুরোধ করবো আপনাদের কাছে। যে সমস্ত অবাঙালি এখানে আছে, যারা আলবদর-রাজাকার নয়, যারা বাংলার মাটিতে বাঙালি হিসেবে বাস করতে চায়, আমি আগেও বলেছি, এখনো বলি, তাদের বাংলায় থাকবার অধিকার রয়েছে। যারা যেতে চায়, ভুট্টো সাহেব যেন মেহেরবানি করে তাদের নিয়ে যান। আমার আপত্তি নাই। তিনি বলছেন তিনি তাদের নেবেন না। কেন নেবেন না? তাদের হাতে তো বন্দুক তাঁরাই দিয়েছিলেন। তাদের তো ব্যবহার করেছিলেন। তাদের দিয়ে বাঙালিদের হত্যা করিয়েছিলেন। এখন কেন নেবেন

না? যারা যেতে চায়, তাদের নিয়ে যান। আমি ছেড়ে দেবো। আমার ৪ লাখ লোক ফেরত দিন। পশ্চিম পাকিস্তানেরও অনেক লোক আমার কাছে আছে। ভুট্টো সাহেব আমার লোক ফেরত দিন, আমিও তাদের লোক ফেরত দিচ্ছি। যুদ্ধবন্দির সঙ্গে জনসাধারণ কোন দিন এক হতে পারে না। এমন নজির দুনিয়ায় নাই, কোনদিন হয় নাই।'

বঙ্গবন্ধু স্বদেশে ফিরে স্বাধীন বাংলার পাহাড় সমান সমস্যা ডিঙ্গিয়ে আলোর পথে হাঁটতে শুরু করলেন। শূন্য তহবিলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াতে উদ্যোগী হলেন। অচল কারখানা সচল করার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। ভাঙ্গা রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ পুনর্গঠনে হাত দিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পর ৩২ মাস দিবা-রাত্র পরিশ্রম করে ১২৬টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন করলেন। এত কিছু অর্জনের মধ্যেও তাঁর অন্তরে দানা বেঁধে ছিলো পাকিস্তানে আটক বাঙালিরা।

বাংলার মাটিতে ত্যাগী মানুষের অভাব হয় না। আবেগী মানুষের কমতি কখনো এদেশে দেখা যায়নি। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাঙালি সর্বোচ্চ আসনে বসেও মানুষের প্রতি ভালোবাসা-মায়া-মমতা-আদর-স্নেহ দেখাতে কখনো কার্পণ্য করেনা। পাকিস্তানে আটক বাঙালির সংখ্যা একজন হলেও সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তার জন্যে শুধু অশ্রুপাতই করতো না, প্রয়োজনে সদ্য স্বাধীন বাংলায় আবার অস্ত্র ধরতো। ছিনিয়ে নিয়ে আসতো তাদের একজন কাঙ্খিত বাঙালিকে, যাকে তারা অন্তরের গহীনে স্বজন মনে করে। একজন বন্দি বাঙালির জন্যেও যে বাঙালি জাতি জানবাজি রেখে আবার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সেই বাঙালি কীভাবে চার লক্ষ বাঙালিকে পাকিস্তানে বন্দি রেখে সুখ-শান্তিতে, আরাম-আয়াশে দিন কাটাতে পারে! কী করে বাঙালি জাতি স্বাধীন দেশে পরম প্রাপ্তির আনন্দে মেতে থাকতে পারে!

১৯৫২'র চেতনা ধারণ করে '৭১-এর বিজয়ের স্ফুলিঙ্গ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় চিঠি লেখেন। চিঠির ভাষা ছিল অত্যন্ত সাবলিল। পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্যের বিচারে কালোত্তীর্ণ। পররাষ্ট্রনীতি এবং আন্তর্জাতিকতায় ছিল সমৃদ্ধ। চিঠির বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য পেয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত পাকিস্তানের অন্যায়-অনায্য ভূমিকা। ভুট্টো একাত্তরের পরাজয়

কখনো মানতে পারেনি। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বাংলার মসৃণ স্বাধীনতাকে কলংকিত করার জন্যে ১৯৭৩ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে 'পূর্ব পাকিস্তান' হিসাবে পরিচয় দিয়ে পাকিস্তানের সংসদ পররাষ্ট্রনীতিতে দূর্বিনীত আচরণ করলো। পাকিস্তানের কর্মকান্ডে সারা বিশ্ব হতবাক হলো। বিষয়টি বঙ্গবন্ধু গভীর কষ্টের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন। প্রতিবাদ করার জন্যে আন্তর্জাতিক পরিসরে তিনি বেছে নিলেন মাতৃভাষা বাংলাকে। এ যেনো ১৯৪৭-এ দেশভাগের পর থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা বাংলাকে অপমানিত-অবদমিত করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের যে অশুভ পাঁয়তারা তার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ক্ষুরধার লেখনী। এ যেনো বাংলা ভাষাভাষির কাছে অহংবোধের বিশাল ঠিকানা রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। এছাড়াও, নিক্সনকে লেখা বঙ্গবন্ধুর চিঠিটি ছিলো আন্তর্জাতিক পরিসরে আপস-মিমাংসায় এবং কূটনৈতিক জগতে সাড়া জাগানোর মতো একটি বিষয়। বাংলায় লেখা বঙ্গবন্ধুর চিঠিটি আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় আজও প্রাসঙ্গিক। চিঠিটি এখানে হুবহু দেয়া হলোঃ

'মহামান্য রিচার্ড এম. নিক্সন, যুক্তরাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান, ওয়াশিংটন।

মহামান্য,

যথা সম্মানের সাথে জানাচ্ছি, আমার তরফ থেকে আপনাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন এবং সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যৌথভাবে গৃহীত মানবিক উদ্যোগ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অবহিত করার জন্য আমার বিশেষ দূত জনাব এম. আর. সিদ্দিকী যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন। বিশ্বের সকলেই জানেন যে বাংলাদেশে অমানুষিক ও নৃশংসতম গণহত্যার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীই দায়ী, যার ফলে নারী-শিশুসহ আমার দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশ হয়েছে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। এই ঘটনাবলীর আলোকেই ভারত ও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক যুক্ত ঘোষণার পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন। এমন কি আজও পাকিস্তান জোরপূর্বক আটক রাখাতে তিন লক্ষ নিরীহ বাঙালি অকথ্য দুঃখ-দুর্দশা এবং চরম নির্যাতন ভোগ করে চলেছেন।

আমার সরকার এই উপমহাদেশে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য শুরু থেকেই এ ব্যাপারে সক্রিয় ও প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করে আসলেও, দুঃখজনক এই যে পক্ষান্তরে পাকিস্তান এ প্রশ্নে পশ্চাদমুখী ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। পাকিস্তান কর্তৃক সম্প্রতি গৃহীত শাসনতন্ত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে যে বৈরী তা আরো একবার প্রতিপন্ন হলো।

পাকিস্তানের বৈরী ও একগুঁয়ে মনোভাব সত্ত্বেও আমার সরকার দেশের সংবিধান প্রণয়ন এবং সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর উপমহাদেশের সকল অমীমাংসিত বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে আমাদের অব্যাহত আন্তরিক প্রচেষ্টার সঙ্গে সংগতি রেখেই বিগত ১৭ই এপ্রিল ভারত সরকারের সাথে যুক্তভাবে একটি পবিত্র ঘোষণা প্রচার করেছে। এই যুক্ত ঘোষণায় পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী, পাকিস্তানে আটক বাংগালী এবং বাংলাদেশে অবস্থানকারী পাকিস্তানী, যারা নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তাদের যুগপৎ হস্তান্তরের মাধ্যমে সকল মানবিক সমস্যার সমাধান করতে চাওয়া হয়েছে। এটা আমার আন্তরিক বিশ্বাস আমাদের তরফ থেকে গৃহীত এই উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট সরকারগুলিকে রাজনৈতিক ও আইনগত দিক দিয়ে কোন প্রকার বিব্রত অবস্থায় না ফেলে মানবিক সকল সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে গঠনমূলক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আমি আরো মনে করি যে বহু সংখ্যক মানুষের দুঃখকেই লাঘবের ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট সমাধান পাওয়ার মতো অনুকূল সুযোগ এখন সৃষ্টি হয়েছে।

এই উপমহাদেশের সকল মানুষের কল্যাণের ব্যাপারে আপনি যে উদগ্রীব সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। তাই আমার বিশেষ দূত জনাব এম. আর. সিদ্দিকী উল্লিখিত যুক্ত ঘোষণার উদ্দেশ্যে ও পরিধি ব্যক্তিগতভাবে আপনার সমীপে ব্যাখ্যা করার জন্য সুযোগ কামনা করবেন।

আপনার স্বভাবসিদ্ধ মহানুভবতার সাথে জনাব এম. আর. সিদ্দিকীকে সাক্ষাৎদান এবং তিনি আপনার সমীপে আমার সরকার ও আমার তরফ থেকে যে সকল বক্তব্য রাখবেন তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

মহাত্মন, আমার গভীরতম শ্রদ্ধার আশ্বাস গ্রহণ করুন।

শেখ মুজিবুর রহমান, ২৮ (অস্পষ্ট) এপ্রিল ১৯৭৩ প্রধানমন্ত্রী।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সমস্যা মাথায় রেখে দ্বিতীয়তম বিজয় দিবসের সামনের দিন অর্থাৎ ১৯৭৩ এর ১৫ই ডিসেম্বর বললেনঃ 'আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিরোধ গ্রহণের নীতিতে বিশ্বাসী নই। তাই মুক্তিযুদ্ধের শত্রুতা করে যারা দালাল আইনে অভিযুক্ত ও দন্ডিত হয়েছিলেন- তাদের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে। দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাভাবিক জীবন যাপনের আবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, অন্যের প্ররোচনায় যারা ভ্রান্ত হয়েছেন এবং হিংসার পথ গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও অনুতপ্ত হলে তাঁদের দেশগড়ার সংগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।'

সাধারণ মানুষের আবেগ থার্মোমিটারের পারদে বুঝতে পেরে সেসময়ে জাতির বিবেক বলে পরিচিত বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আবুল মুনছুর আহমদ, আতাউর রহমান, মওলানা ভাসানীসহ আরো অনেক জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ পাকিস্তানে বন্দি বাঙালিদের মুক্ত করার আকাঙ্খায় যুদ্ধাপরাধী ১৯৫ জন পাকিস্তানী সেনার বিচারের বিরোধিতা শুরু করলেন। পরিস্থিতি অনুধাবন করে আবুল মুনছুর আহমদ সময়পোযোগী আবেগময় একটি বক্তব্য দিলেনঃ 'পৃথিবীর কোন্ দেশ ত্যাগ ছাড়া স্বাধীনতা পেয়েছে? কোন্ দেশের মানুষ জীবন দেয়া ছাড়া মুক্তি পেয়েছে? এত ত্যাগ, এত শহীদ, এত মৃত্যু ইত্যাদি দেশের মানুষ দিয়েছেতো স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য। এসব কিছুর বিনিময়েই তো স্বাধীনতা। এরপর আবার বিচার কি? প্রতিশোধ কি? স্বাধীনতা পাওয়াই তো বড় প্রতিশোধ, বড় বিচার।'

বঙ্গবন্ধুও পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের বিচারের হুমকির প্রতিবাদে বলেন, 'এটা অবিশ্বাস্য ও অমানবিক, এই মানুষগুলো ডাক্তার, বিজ্ঞানী, সরকারী ও সামরিক কর্মকর্তা যারা বাংলাদেশে ফেরত আসতে চায়, এরা কী অপরাধ করেছে? এটা ভুট্টোর কি ধরনের প্রতিহিংসাপরায়ণতা?'

বঙ্গবন্ধু আস্তে আস্তে বুঝতে পারলেন স্বাধীনতা অর্জনের পরও বাংলাদেশে উত্তেজনা জিইয়ে রাখলে অনেক সমালোচক রাষ্ট্র আরো ঢালাওভাবে বাংলাদেশের সমালোচনা করবে। বিপুলসংখ্যক যুদ্ধবন্দিকে আটকে রেখে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলে পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে না। উপমহাদেশে স্বাভাবিক পরিস্থিতি এবং শান্তি রক্ষার স্বার্থে ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২-এ দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু ভাষণে বলেছিলেন- 'আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্যে কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়'। একই দিনে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু পালাম বিমানবন্দরের বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন, 'আজ আমার কারও বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেই'- বক্তৃতামালার কথাগুলো বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন বলেই ১৯৭৪ এর ১৮ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পরপর ২৫ই সেপ্টেম্বর বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় অনেক বিষয়ের সাথে বিশ্বশান্তির উপর গুরুত্ব দিয়ে বললেনঃ

'পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য আমরা কোন উদ্যোগ বাদ দেই নাই এবং সবশেষে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দিকে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমরা চূড়ান্ত অবদান রাখিয়াছি। ঐ সকল যুদ্ধবন্দি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে। ইহা হইতেছে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ও উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ শান্তি ও স্থায়িত্ব গড়িয়া তোলার পথে আমাদের অবদান। এই কাজ করিতে গিয়া আমরা কোন পূর্বশর্ত আরোপ অথবা কোন দরকষাকষি করি নাই। আমরা কেবল আমাদের জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কল্পনায় প্রভাবিত হইয়াছি।'

শেখ মুজিব ছিলেন একজন চৌকস রাজনীতিবিদ। বাংলার প্রতিটি ধুলিকণার ভাষা বুঝতেন। তিনি তাঁর সাহস, দূরদর্শীতা এবং বিচক্ষণতা দিয়ে বুঝতে পারতেন বাস্তবতার কলুষিত বাতাস। বাংলার স্বাধীন ভূখন্ড রক্ষা করতে হলে দেশের জনগণ তাঁর সাথে আছে বুঝতে পেরে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে তিনি নতুন করে ভাবলেন। মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে চরম বাস্তবতা দিয়ে ধরে রাখার জন্যে শেখ মুজিব নিউইয়র্কে বক্তব্য দিতে দিতে নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়ে আঙ্গুল ঘষতে লাগলেন। বঙ্গবন্ধুর আঙ্গুল ঘষা ছিলো প্রতিকী। আঙ্গুল ঘষে ঘষে তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন হাতের আঙ্গুল থেকে মেঝেতে কিছু দূষিত ধুলিকণা ঝরে পড়তেই

পারে। হাত ঘষতে ঘষতেই বঙ্গবন্ধু বললেন, 'যুদ্ধবন্দিদেরকে আমি আমার এই আঙ্গুলসমূহের ফাঁক ফোকর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছি'। বঙ্গবন্ধুর সেদিনের প্রতিকী আচরণ অনেক দিনের পুষে রাখা মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তিনি ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছেন যুদ্ধজয়ের পর প্রতিহিংসার আয়ু বেশি দিন থাকে না। দেশ গড়তে হলে বিদেশ লাগে- বিদেশের সহায়তা লাগে। একা পথ অতিক্রম করে বেশি দূর যাওয়া যায় না। এছাড়াও তিনি যুদ্ধবন্দিদের বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়ে বিশ্বসভায় অর্জন করেন সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য মান-মর্যাদা। যুদ্ধাপরাধীদের শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমার পর দেখা গেল, যেদেশ অস্ত্রবোঝাই জাহাজ পাঠাচ্ছিল সেদেশই শান্তির জন্যে খাদ্য পাঠাচ্ছে। যেদেশগুলো বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছিলো না, সেদেশগুলোই অনায়াসে স্বীকৃতি দিতে শুরু করলো । বিষয়টি এরকম 'বিচিত্র এদেশ নয়, বিচিত্র এবিশ্ব সেলুকাস'।

'দালাল আইন' জাতিকে বিভক্ত করার জন্যে যারা দায়ী করলো তারাও আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকার অভিনয় করলো। বাস্তবতার কারণে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সাহসীকতায় যুদ্ধাপরাধিদের ক্ষমা করলেও হত্যা, ধর্ষণ, আগুন দেয়া, লুটপাটের মতো গুরুতর অপরাধ ক্ষমা করলেন না। সাধারণ ক্ষমায় পঁচিশ হাজার সাতশত উনিশ জন মুক্তি পেলেও অবশিষ্ট এগার হাজার বন্দি যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিলো।

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলো ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪-এ। স্বীকৃতি দেবার পূর্বমুহূর্তগুলো ছিলো নাটকে-নাটকে পরিপূর্ণ। নাটকটির বিষয় ছিলো আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান। স্থান পাকিস্তানের লাহোর। নাটকের পটভূমি রচিত হলো ১৯৭৪ সালের ২২ থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী। লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করবে কিনা সেই প্রশ্নে আরবদেশগুলোর চাপাচাপিতে ভুট্টো অবশেষে বঙ্গবন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাতে রাজি হলো। কূটকৌশলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান হিসাবে আমন্ত্রণ না করে পূর্বাঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীর নেতা হিসাবে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত হলো। বঙ্গবন্ধুর সরকার বিষয়টি জেনে দৃঢ়তার সাথে স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখান করে জানিয়ে দেয় বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র

হিসেবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি ছাড়া কোন আলোচনা হবে না। বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবের বিপরীতে ভুট্টো বলেন আলোচনার পর স্বীকৃতি দেয়া হবে। বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে এলো বন্ধুদেশ ভারত। বঙ্গবন্ধু ভারতকে বলেন, ১৯৭২ এর আগস্টে নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের আনুষ্ঠানিক অনুরোধে চীন ভেটো দেওয়ায়- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এজন্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের স্বীকৃতির বিষয়টি বাংলাদেশের আরো বেশী প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু ভারতকে সরাসরি বলেন, 'প্রথমে স্বীকৃতি তারপর আলোচনা'। ফলশ্রুতিতে, ১০ই জুলাই ১৯৭৩-এ পাকিস্তানের সংসদ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়ে কিছু শর্ত সাপেক্ষে ভুট্টোকে ক্ষমতা প্রদান করে।

এদিকে ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় ইতিবাচক ভুমিকা রাখার জন্যে এগিয়ে এসে প্রস্তাব দিলেন বাংলাদেশ যদি বন্দি যুদ্ধাপরাধি ১৯৫ জন পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারবে এমন একটি সন্তোষজনক আশ্বাস দেয় তাহলে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। এরকম প্রস্তাবেও বঙ্গবন্ধু দ্ব্যার্থহীনভাবে জানিয়ে দিলেন স্বীকৃতির আগে এমন কোন আশ্বাস তিনি দেবেন না। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে ইসলামিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগের রাতে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। পাশাপাশি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রভাবশালী দেশ মিশর, সৌদি আরব, এবং ইন্দোনেশিয়া অবিলম্বে সমস্যা সমাধানের জন্যে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগ শুরু করে। পরিণামে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ সালে ইসলামিক সম্মেলনের শুরুতে লাহোরে অবস্থিত টেলিভিশন ষ্টুডিওতে দেয়া এক বক্তৃতায় ভুট্টো আর্তনাদের মতো একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, 'আল্লাহর নামে এবং এদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি যে, আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছি। ... আমি বলছি না যে এটি আমি পছন্দ করছি, আমি বলছি না যে আমার হৃদয় আনন্দিত। এটি আমার জন্য একটি আনন্দের দিন নয়, কিন্তু বাস্তবতাকে আমরা বদলাতে পারিনা'।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বন্দি ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচার করার বিষয়ে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিনা এবিষয়ে ভূট্টো কোন কিছুই বললেন না। নির্মোহ ইতিহাস বলছে, একটি ফলপ্রসূ আলোচনার মাধ্যমে

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের নিকট থেকে যুদ্ধবন্দির বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই বাংলাদেশ পাকিস্তানের স্বীকৃতি লাভ করতে সফল হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২-এ দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে দার্শনিকের মতো যথার্থই বলেছিলেন- 'আমি ফিরে যাচ্ছি আমার হৃদয়ে কারো জন্যে কোন বিদ্বেষ নিয়ে নয়'। বঙ্গবন্ধু সত্যি কোনদিন হৃদয়ে কোন বিদ্বেষ নিয়ে রাজনীতি করতেন না। পাকিস্তান ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪-এ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পর ১৯৭৪ এর ৯ই এপ্রিল দিল্লীতে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী বাংলাদেশ থেকে মুক্তি পেয়েছিলো।

তথ্যসূত্র ঃ

১। বাঙালির কণ্ঠ (বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, বিবৃতি ও ঘোষণার সংকলন)ঃ আগামী প্রকাশনী, পৃঃ ২৬২, ২৯৯

২। ওঙ্কার সমগ্র (বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণের শ্রুতিলিপি)ঃ ঐতিহ্য পৃঃ ২১, ২৩

৩। বাংলাদেশ স্বাধীনতা ও ন্যায়ের সন্ধানে ঃ ডঃ কামাল হোসেন ঃ প্রথমা প্রকাশন, অনুবাদ মিজানুর রহমান খান

৪। বঙ্গবন্ধু জননায়ক থেকে রাষ্ট্রনায়কঃ কবির চৌধুরী সম্পাদিতঃ অন্বেষা প্রকাশন

৫। নিক্সনকে বঙ্গবন্ধুর বাংলা চিঠি, মিজানুর রহমান খান, প্রথম আলো, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০

৬। যুদ্ধাপরাধ ঃ পর্ব-৪ (বঙ্গবন্ধু কর্তৃক দালাল আইনে সাধারণ ক্ষমা ঘোষনার প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস, blog.bdnews24.com

নেতারা যদি নেতৃত্ব দিতে ভুল করে জনগণকে তার খেসারত দিতে হয়

বঙ্গবন্ধু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা নিরসন করা সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তি জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন থেকে উদ্ভূত যে কোন সমস্যার সমাধান আলোচনার মাধ্যমে সম্ভব। দেশ-দশের মঙ্গল চিন্তা না করে বঙ্গবন্ধু পদ-পদবী-ক্ষমতার লোভে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যে কোন পদক্ষেপ নিতেন না। কোন কাজ করতেন না। আন্দোলন-সংগ্রাম, মিটিং-মিছিল, পিকেটিং-হরতাল যা কিছুই করতেন না কেন- বঙ্গবন্ধু কখনো নিজেকে প্রকাশ করার জন্যে করতেন না। তাঁর জীবন প্রবাহ ছিল মানুষের জন্যে, দেশের জন্যে। স্বার্থের কারণে কেউ কোন অবস্থান নিলে বঙ্গবন্ধু ভালো চোখে দেখতেন না। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনে রাজনীতিবিদরা কোনো আলোচনায় না যেয়ে নেতৃত্বের পদ-পদবী নিয়ে কে, কাকে শায়েস্তা করবে সেদিকে বিভোর হয়ে থাকলো। সামান্য সময়ের জন্যে তাদের চিন্তায় এলো না জনগণ তথা রাষ্ট্রের কথা। যে যার মতো নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে দৌড়-ঝাপ শুরু করলো। নাজিমউদ্দিন সাহেব নেতা নির্বাচিত হয়েই কোন পরিণতির কথা না ভেবে ঢাকাকে রাজধানী করা হবে বলে ঘোষণা দিলেন। একটিবারের জন্যেও তিনি চিন্তা করলেন না- পশ্চিম বাংলায় থেকে যাওয়া মুসলমানদের কী হবে? 'কলকাতা'য় অবস্থান করে অন্যান্য নেতাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দর কষাকষি করে যে সমস্ত বিষয়াদি ভাগ-বন্টন করে নিয়ে আসা যেতো, সেদিকেও খেয়াল করলেন না। ইতিহাস-ভূগোল-বাস্তবতার আলোকে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস

করতেন পাকিস্তানের অংশে কলকাতা অন্তর্ভূক্ত হলে কলকাতাকে ঘোষণা করা হতো পাকিস্তানের রাজধানী। বঙ্গবন্ধুর কাছে পাকিস্তানের রাজধানী 'কলকাতা' হওয়ার পিছনে আরো অনেক অকাট্য যুক্তি ছিল। কলকাতা পাকিস্তানের অংশ হলে পূর্ববাংলা জনসংখ্যার বিচারে অনেক এগিয়ে থাকতো অর্থাৎ সন্দেহাতীতভাবে পূর্ববাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতো। সর্বোপরি কলকাতা ১৯১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল সারা ভারতবর্ষের রাজধানী। ভারত ভাগের সময়কালেও ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহর হিসেবে 'কলকাতা'কে সবাই একবাক্যে স্বীকার করতো।

আলাপ-আলোচনা-পরামর্শ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত গোত্রভূক্ত মানব সম্প্রদায়ের জন্যে কল্যাণ বয়ে আনে না। হাজার বছর ধরে গোত্রভিত্তিক সমাজজীবনে পরস্পর পরস্পরের সাথে যে নিবিড় সম্পর্ক তৈরী হয় তা হঠাৎ করেই বৈরী বাতাসে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। আলাপ-আলোচনা ছাড়া যে কোন সিদ্ধান্তে সমাজজীবনে নেমে আসে ভয়াবহতা। আলোচনাহীন সিদ্ধান্তের ভয়াবহতা বুঝানোর জন্যে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র একটি অংশ উল্লেখ করছি ঃ

'নাজিমুদ্দীন সাহেব নেতা নির্বাচিত হয়েই ঘোষণা করলেন, ঢাকা রাজধানী হবে এবং তিনি দলবলসহ ঢাকায় চলে গেলেন। একবার চিন্তাও করলেন না, পশ্চিম বাংলার হতভাগা মুসলমানদের কথা। এমনকি আমরা যে সমস্ত জিনিসপত্র কলকাতা থেকে ভাগ করে আনব তার দিকেও ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ফলে যা আমাদের প্রাপ্য তাও পেলাম না। সরকারি কর্মচারীরা ঝগড়া গোলমাল করে কিছু কিছু মালপত্র স্টিমার ও ট্রেনে তুলতে পেরেছিলেন, তাই সম্বল হল। কলকাতা বসে যদি ভাগ বাটোয়ারা করা হত তাহলে কোনো জিনিসের অভাব হত না। নাজিমুদ্দীন সাহেব মুসলিমলীগ বা অন্য কারোর সাথে পরামর্শ না করেই ঘোষণা করলেন ঢাকাকে রাজধানী করা হবে। তাতেই আমাদের কলকাতার উপর আর কোনো দাবি রইল না। এদিকে লর্ড মাউন্টব্যাটেন চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েছিলেন, কলকাতা নিয়ে কি করবেন? 'মিশন উইথ মাউন্ডব্যাটেন' বইটা পড়লে সেটা দেখা যাবে। ইংরেজ তখনও ঠিক করে নাই কলকাতা পাকিস্তানে আসবে, না হিন্দুস্তানে থাকবে। আর যদি কোনো উপায় না থাকে তবে একে 'ফ্রি শহর' করা যায় কি না? কারণ, কলকাতার হিন্দু-মুসলমান লড়বার জন্য প্রস্তুত। যে কোন সময়

দাঙ্গাহাঙ্গামা ভীষণ রূপ নিতে পারে। কলকাতা হিন্দুস্তানে পড়লেও শিয়ালদহ স্টেশন পর্যন্ত পাকিস্তানে আসার সম্ভাবনা ছিল। হিন্দুরা কলকাতা পাবার জন্য আরও অনেক কিছু ছেড়ে দিতে বাধ্য হত।

এই বইতে আরও আছে, একজন ইংরেজ গভর্নর হয়ে ঢাকা আসতে রাজি হচ্ছিল না, কারণ ঢাকায় খুব গরম আবহাওয়া। তার উত্তরে মাউন্টব্যাটেন যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল, 'পূর্ব পাকিস্তানে দুনিয়ার অন্যতম পাহাড়ি শহর, থাকার কোন কষ্ট হবে না।' অর্থাৎ দার্জিলিংও আমরা পাব। তাও নাজিমুদ্দীন সাহেবের এই ঘোষণায় শেষ হয়ে গেল। যখন গোলমালের কোনো সম্ভাবনা থাকল না, মাউন্টব্যাটেন সুযোগ পেয়ে যশোর জেলার সংখ্যাগুরু মুসলমান অধ্যুষিত বনগাঁ জংশন অঞ্চল কেটে দিলেন। নদীয়ায় মুসলমান বেশি, তবু কৃষ্ণনগর ও রানাঘাট জংশন ওদের দিয়ে দিলেন। মুর্শিদাবাদে মুসলমান বেশি কিন্তু সমস্ত জেলাই দিয়ে দিলেন। মালদহ জেলায় মুসলমান ও হিন্দু সমান সমান তার আধা অংশ কেটে দিলেন, দিনাজপুরে মুসলমান বেশি, বালুরঘাট মহকুমা কেটে দিলেন যাতে জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং হিন্দুস্তানে যায় এবং আসামের সাথে হিন্দুস্তানের সরাসরি যোগাযোগ হয়। উপরোক্ত জায়গাগুলি কিছুতেই পাকিস্তানে না এসে পারত না। এদিকে সিলেটে গণভোটে জয়লাভ করা সত্ত্বেও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ করিমগঞ্জ মহকুমা ভারতবর্ষকে দিয়েছিল। আমরা আশা করেছিলাম, আসামের কাছাড় জেলা ও সিলেট জেলা পাকিস্তানের ভাগে না দিয়ে পারবে না। আমার বেশি দুঃখ হয়েছিল করিমগঞ্জ নিয়ে। কারণ, করিমগঞ্জে আমি কাজ করেছিলাম গণভোটের সময়। নেতারা যদি নেতৃত্ব দিতে ভুল করে, জনগণকে তার খেসারত দিতে হয়। যে কলকাতা পূর্ব বাংলার টাকায় গড়ে উঠেছিল সেই কলকাতা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলাম। কেন্দ্রীয় লীগের কিছু কিছু লোক কলকাতা ভারতে চলে যাক এটা চেয়েছিল বলে আমার মনে হয়। অথবা পূর্বেই গোপনে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী নেতা হলে তাদের অসুবিধা হত তাই তারা পিছনের দরজা দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাইল। কলকাতা পাকিস্তানে থাকলে পাকিস্তানের রাজধানী কলকাতায় করতে বাধ্য হত, কারণ পূর্ব বাংলার লোকেরা দাবি করত পাকিস্তানের জনসংখ্যায়ও তারা বেশি আর শহর হিসাবে তদানীন্তন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহর কলকাতা। ইংরেজের শাসনের প্রথমদিকে কলকাতা একবার সারা ভারতবর্ষের রাজধানীও ছিল।'

বঙ্গবন্ধু ইতিহাস সচেতন ছিলেন। নিজের হাতের তালুর মতো ভারতবর্ষের ভূগোল ছিল তাঁর কাছে দৃশ্যমান, সুপরিচিত। ইতিহাসের প্রতিভাধর ছাত্রের মতো লাহোর প্রস্তাব তাঁর ছিল পুরো আয়ত্বে। রাজনীতিতে তাঁর দর্শনে লাহোর প্রস্তাব খুব গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। লাহোর প্রস্তাবানুযায়ী ভারতবর্ষ তিনভাগে বিভক্ত হওয়ার কথা। বাংলা ও আসাম নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান নামের একটি রাষ্ট্র হবে- যা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত, ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে গঠিত হবে পশ্চিম পাকিস্তান- যা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। বাকী অংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে হিন্দুস্তান। বঙ্গবন্ধু ভারতবর্ষকে ভালোভাবে বুঝতে সবসময় ভারতবর্ষের মানচিত্র সাথে রাখতেন। ভারতবর্ষের মানচিত্র তাঁর কাছে জ্যামিতির ভাষায় সম্পাদ্য হলে উপপাদ্য হিসেবে সবসময় চর্চার জন্য কাছে রাখতেন 'পাকিস্তান' নামের দুইটি বই। একটির লেখক হাবীবুল্লাহ বাহার অন্যটির লেখক মুজিবুর রহমান খা।

ভারত বিভাজনে ইংরেজের সাথে দেশীয় রাজনীতিবিদদের অপরিমেয় নির্বুদ্ধিতা ভারতবাসীকে অনন্তকালের জন্যে নিক্ষেপ করলো অস্থিরতার মহাসাগরে। বঙ্গবন্ধুর চে' বয়সে ৩২ বছরের বড়, ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্যকে হৃদয়ে ও মননে ধারণ করে মওলানা আবুল কালাম আজাদ মেনে নিতে পারেননি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রগঠন। ক্ষুদ্র স্বার্থে, ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে চাষাবাদের জন্যে ভারত ভূখন্ডকে বীজতলা হিসেবে ব্যবহার করার বিপক্ষে তিনি ছিলেন শতভাগ সোচ্চার। মওলানা আজাদ অত্যন্ত উজ্জ্বল শব্দে ১৯৪৭-এ ভারত বিভাজনের বর্ণনা দিয়েছেন, 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম' গ্রন্থে। তার অংশ বিশেষ হলো-

'পরিস্থিতিটি এমন ছিল যাতে ট্র্যাজেডি ও কৌতুক ব্যাখ্যাতীতভাবে মিশ্রিত হয়েছিল। দেশ বিভাগের পর সবচেয়ে হাস্যকর অবস্থা হয়েছিল সেসব মুসলিম লীগ নেতাদের, যারা ভারতে ছিলেন। জিন্নাহ করাচি চলে গেলেন, অনুসারীদের জন্য রেখে গেলেন এই মর্মে একটি বার্তা যে এখন দেশ বিভক্ত হয়েছে, কাজেই তাদের উচিত ভারতের অনুগত নাগরিক হয়ে থাকা। বিদায়ী এ বার্তা তাদের মধ্যে দুর্বলতা ও মোহমুক্তির এক অদ্ভুত বোধ সৃষ্টি করেছিল। এসব নেতারা অনেকেই ১৪ই আগস্টের পর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাদের

দশা ছিল করুণ। গভীর অনুতাপ ও ক্রোধের সঙ্গে তারা প্রত্যেকে বলেছিলেন যে জিন্নাহ তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন এবং নিঃসহায় অবস্থায় ত্যাগ করেছেন।

জিন্নাহ তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন বলতে তারা কী বোঝাতে চাইছেন, তা আমি প্রথমে অনুধাবন করতে পারিনি। তিনি প্রকাশ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ দাবি করেছিলেন। দেশ বিভাগ এখন পশ্চিম ও পূর্ব উভয় স্থানেই বাস্তব ঘটনা। তাহলে মুসলিম লীগের এ মুখপাত্ররা কেন বলেছেন যে তাদের প্রতারিত করা হয়েছে?

তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলাম যে এ মানুষগুলো দেশ বিভাগের এমন একটি চিত্র মনে মনে কল্পনা করে এসেছেন, যার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার কোনো মিল নেই। তারা পাকিস্তানের আসল তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ যদি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করে, তবে এটা স্পষ্ট যে যেসব প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সেসব প্রদেশ ভারতের অংশ হবে। ইউপি ও বিহারে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু ছিল, দেশ বিভাগের পরও তা-ই থাকবে। এ কথা অদ্ভুত কিন্তু সত্য হলো এই যে এই মুসলিম লীগারদের বোকার মতো বোঝানো হয়েছিল, একবার পাকিস্তান গঠিত হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ যেকোনো প্রদেশ থেকে আসা মুসলমানরা পৃথক জাতি হিসেবে পরিগণিত হবে এবং তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুযোগ পাবে। এখন যখন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহ ভারতের বাইরে চলে গেল এবং বাংলা ও পাঞ্জাব পর্যন্ত বিভক্ত হয়ে পড়ল, আর মি. জিন্নাহ করাচির উদ্দেশ্যে চলে গেলেন, তখন এই বোকারামগণ বুঝতে পারল যে তারা কিছুই অর্জন করতে পারেনি, বরং ভারত বিভাগের মাধ্যমে সবকিছু খুইয়েছে। জিন্নাহর বিদায়ী বার্তা হানল সর্বশেষ আঘাত। এটা এখন তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে দেশ বিভাগের একমাত্র ফল একটিই-সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের অবস্থান আগের তুলনায় এখন দুর্বলতর। অধিকন্তু তারা তাদের বোকামির দ্বারা হিন্দুদের মনে ক্রোধ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছিল।'

ভারত বিভাজনের শিকার দুই মহামানবের (মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও শেখ মুজিবুর রহমান) তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন আবেগতাড়িত লেখার পাশাপাশি বিগত দিনের লাহোর প্রস্তাব আমাদের নতুন করে আলোড়িত করে। নতুন করে ভাবিয়ে

তোলে। বাস্তবতার কশাঘাতে মনে হয় লাহোর প্রস্তাব ২৩শে মার্চ ১৯৪০ সালে হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়েনি। হঠাৎ করে ভূঁইফোড়ের মত অস্তিত্ব জাহির করেনি। লাহোর প্রস্তাব এসেছিল ভারতবর্ষের অগনিত মানুষের হাহাকার থেকে, বঞ্চনা থেকে, নিপীড়ন থেকে। পলাশীর প্রান্তে ১৭৫৭ সালে ইংরেজের কাছে মুসলিম নবাবের পরাজয় থেকে ভারতবর্ষে তিনটি শক্ত প্রতিপক্ষের জন্ম হয়। জয়ী দল হিসেবে ব্রিটিশের আত্মপ্রকাশ ছিলো ভারতবাসীর জন্যে অমঙ্গলের সূচনাপর্ব। পরাজিত দল হিসেবে থেকে গেলো মুসলিম সম্প্রদায়- যারা দীর্ঘদিন যাবত হিন্দুদের কাছে আস্থাভাজন হতে পারেনি। তৃতীয় দল হিসেবে নেপথ্যে বিচরণ করতে থাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু লোকজন। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল মুসলিম সেনাপতিরা তাদের কাছ থেকে তলোয়ারের জোরে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছে। ভারতবর্ষে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত দৃশ্যতঃ তিন ধর্মানুসারি মানুষের পাশাপাশি বসবাস থাকলেও মনে মনে তাদের সহাবস্থান কখনো তৈরি হয়নি।

ইংরেজরা লক্ষ্য করলো ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সিপাহি বেশী সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম থেকেই নানা কারণে ইংরেজরা মুসলমানদের উপর রুষ্ট ছিল। এবার যুক্ত হলো নতুন একটি অনুষঙ্গ। পরিণামে ইংরেজদের সুদূরপ্রসারী নীতির কাছে শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানরা যথারীতি পিছিয়ে থাকলো। ইতিহাসের তথ্য-উপাত্ত আমাদের জানিয়ে দেয় ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৭৮ সালের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলিম স্নাতকধারী ছিলেন মাত্র ৫৭ জন। এসময়ে ৩,১৫৫ জন হিন্দু স্নাতকধারী হয়েছিলেন।

লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে বাংলা ও আসাম পাকিস্তানে থাকবে, নাকি ভারতবর্ষের অংশ হবে, নাকি স্বাধীন থাকবে- সেজন্য বাংলাদেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা একটি আপস-মিমাংসায় এসেছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিলো জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত গণপরিষদ ঠিক করবে বাংলা-আসামের ভবিষ্যৎ। জনাব সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু এই ফর্মুলা নিয়ে জিন্নাহ ও গান্ধীর সংগে দেখা করলেন। পরবর্তীতে শরৎ বসুর বিবৃতিতে জানা গেল তাদের প্রস্তাবটি জিন্নাহ ইতিবাচক সম্মতি দিলেও মহাত্মা গান্ধী ও পন্ডিত নেহেরু নিজেরা সিদ্ধান্ত না দিয়ে সরদার প্যাটেলের কাছে পাঠালে সরদারজি নেতিবাচক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন।

'যুক্তবাংলা হলে হিন্দু-মুসলমানের মঙ্গল হবে' খাজা নাজিমুদ্দীনের বক্তব্যের সাথে মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খা আবেগী কণ্ঠে যোগ করলেন- জীবন থাকতে বাংলাদেশকে ভাগ হতে দেবেন না এবং বাংলা ভাগ করতে হলে তাঁর রক্তের উপর করতে হবে। ভারত ভাগের পূর্বে জনসম্মুখে এক ধরণের নাটক মঞ্চস্থ হলেও নেপথ্যে চলছিল অন্য ধরণের ষড়যন্ত্র, অন্য ধরণের আয়োজন। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পর্দার অন্তরালে যে ধরণের খেলা খেলছিল তা দেখে নজরুল-এর লেখা মনে পড়ে যায়ঃ

'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে
বিরাট শিশু আনমনে'
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা
নিরজনে প্রভু নিরজনে।'

ভারতবাসি দেখলো ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার জন্যে ভারত-পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণের জন্যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে র‍্যাডক্লিফকে। সীমানা নির্ধারিত হলো র‍্যাডক্লিফের পেন্সিলের আগায়। নিরজনে প্রভুর মতো নেপথ্য কারিগর লর্ড মাউন্টব্যাটন। ইংরেজ লর্ডের ছিল মুসলিমের প্রতি, বাংলার প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব। এজন্যে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন গোপনে ষড়যন্ত্র না করে খোলা মনে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলে ভারতবাসীর মঙ্গল হতো। হিন্দু-মুসলিমের প্রীতিবন্ধন থাকতো। ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির চৌহদ্দী ভেঙ্গে বাংলা কখনো ভাগ হতো না। পাঞ্জাব ভাগ হতো না। নেতাদের ভুলে, নেতাদের আলাপ-আলোচনার অভাবে এ অঞ্চলের মানুষগুলোকে এখনও খেসারত দিতে হচ্ছে, দিতে হবে অনন্তকাল।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় বঙ্গবন্ধু দেখতে পেলেন দীর্ঘদিনের বঞ্চনার শিকার মুসলিমরা আবারো নতুন করে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে। নেতৃত্বে পদ-পদবীর লোভে নেতারা অন্ধ হয়ে গেলেন। নেতারা ব্রিটিশ শাসনের বিদ্বেষী মনোভাব থেকে শিক্ষা নিলেন না। তারা তাদের স্বজাতি-স্বগোত্রের সমাজ

ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ইংরেজের দেয়া সামান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে মনোযোগী হলেন। ইংরেজ ১৭৫৭ এর পলাশীর কৌশল আবারও ১৯০ বছর পর ১৯৪৭-এ মঞ্চস্থ করলো। প্রধান সিপাহসালার মীর জাফর নামক ক্ষমতালোভী এক মুসলিমকে পদ-পদবি-ক্ষমতার মোহে ইংরেজরা যে কায়দায় মোহাবিষ্ট করে বিভ্রান্ত করেছিলো, ঠিক একই কায়দায় ক্ষমতালোভী মুসলিম নেতাদের কাজে লাগিয়ে লাহোর প্রস্তাবকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ভারতবর্ষকে ভাগ করলো সেই একই শক্তিধর ইংরেজ। কলকাতায় বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু ছিলেন ইতিহাস বোদ্ধা। ঐতিহাসিক বাস্তবতায় ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কষ্টে বঙ্গবন্ধু আক্রান্ত হলেন, ম্লান হলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল মুসলিম লীগের নেতারা যদি ক্ষমতার মোহে মোহাবিষ্ট না হতো এবং দেশপ্রেমিক নেতাদের সাথে যদি আলাপ-আলোচনা করতো- তাহলে ভারতবর্ষের ভূগোলে এত গোলযোগ হতো না। ভারতবর্ষের অসম বিভাজনের কষ্ট ১৯৪৭ থেকে বহন করে শেখ মুজিব অবশেষে ২০শে জুন ১৯৬৬-তে এসে আক্ষেপে ডায়েরীর পাতায় লিখলেনঃ

'বাংলাদেশ শুধু কিছু বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকদের জন্যই সারাজীবন দুঃখ ভোগ করল। আমরা সাধারণত মীর জাফর আলি খাঁর কথাই বলে থাকি। কিন্তু এর পূর্বেও ১৫৭৬ সালে বাংলার স্বাধীন রাজা ছিল দাউদ কারানী। দাউদ কারানীর উজির শ্রীহরি বিক্রম-আদিত্য এবং সেনাপতি কাদলু লোহানী বেঈমানি করে মোগলদের দলে যোগদান করে। রাজমাবাদের যুদ্ধে দাউদ কারানীকে পরাজিত, বন্দি ও হত্যা করে বাংলাদেশ মোগলদের হাতে তুলে দেয়। এরপরও বহু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এই বাঙালি জাত। একে অন্যের সাথে গোলমাল করে বিদেশি প্রভুকে ডেকে এনেছে লোভের বশবর্তী হয়ে। মীরজাফর আনলো ইংরেজকে, সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করল বিশ্বাসঘাতকতা করে। ইংরেজের বিরুদ্ধে এই বাঙালিরাই প্রথম জীবন দিয়ে সংগ্রাম শুরু করে; সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয় ব্যারাকপুর থেকে। আবার বাংলাদেশে লোকের অভাব হয় না ইংরেজকে সাহায্য করবার। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত এই মাটির ছেলেদের ধরিয়ে দিয়ে ফাঁসি দিয়েছে এদেশের লোকেরাই-সামান্য টাকা বা প্রমোশনের জন্য।

পাকিস্তান হওয়ার পরেও দালালি করার লোকের অভাব হলো না- যারা সব কিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে দিয়ে দিচ্ছে সামান্য লোভে। বাংলার স্বার্থ রক্ষার জন্য

যারা সংগ্রাম করছে তাদের বুকে গুলি করতে বা কারাগারে বন্দি করতে এই দেশে সেই বিশ্বাসঘাতকদের অভাব হয় নাই। এই সুজলা-সুফলা বাংলাদেশ এত উর্বর; এখানে যেমন সোনার ফসল হয়, আবার পরগাছা আর আগাছাও বেশি জন্মে। জানি না বিশ্বাসঘাতকদের হাতে থেকে এই সোনার দেশকে বাঁচানো যাবে কিনা!'

তথ্য সূত্র ঃ

১। অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

২। কারাগারের রোজনামচা, শেখ মুজিবুর রহমান ঃ বাংলা একাডেমি

৩। ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম, মওলানা আবুল কালাম আজাদ (অনুবাদ ঃ লিয়াকত আলি, আসমা চৌধুরী) ঃ সংবেদ প্রকাশনা

৪। ভারত এখন ঃ আন্তর্জাতিকতা বনাম জিঘাংসা, সুমিত মিত্র, দেশ, ১৭ জানুয়ারি, ২০২০

পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি

'আমি কবি মানুষ, জেল আমার ভালো লাগবে না। আমার নামে ওয়ারেন্ট। আমি জেলে গেলে বাঁচবো না'। কথাগুলো উঁচুকণ্ঠে গলগল করে বলছে আর কাঁদছে হুলিয়া-শিকার কবি রফিক আজাদ। রফিক আজাদের উঁচু গলায় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর মা মোহাম্মদপুরের বাবর রোডের বাসায় রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের সন্তানকে শাসন করার মতো গলায় রফিক আজাদকে ধমক সুরে বললেন, 'ক'দিন আগে তোমরা একসঙ্গে যুদ্ধ করেছ আর তুমি এভাবে এখানে এসে কাঁদছ কেন?----- হাত মুখ ধুয়ে আগে কিছু পেটে দাও। তারপর বজ্রর কাছে যখন এসেছ তার যা করার তা সে অবশ্যই করবে। না হলে আমি কি তাকে পছন্দ করব?' মায়ের দেয়া খাবার খেয়ে কবি রফিক আজাদ শক্তি-সাহস সঞ্চয় করে অভিনব কায়দায় কাদের সিদ্দিকীর মাকে বলতে লাগলেন, 'আপনিই বলুন ক্ষুধা লাগলে গ্রামের বাচ্চারা কি বলে? অনেক বাচ্চা বলে না, মা খাবার দিলি না? পেটে আগুন ধরছে। পুইড়া গেল যে! ভাত দে নইলে তোর কইলজা খামু, বলে না?' এরকম ইনিয়ে-বিনিয়ে কথাবিশারদ কবি রফিক আজাদ বিচিত্র ভঙ্গিমায় নতুন নতুন উপমায় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর মায়ের অভিমান-অভিযোগ কমানোর চেষ্টা করলেন। মায়ের নিকট থেকে বিপদমুক্ত হবার কোন আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত রফিক আজাদ তাঁর অভিধানের শব্দভান্ডার কাজে লাগিয়ে মাকে বুঝাতে থাকলেন। মায়ের আদেশে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কাদের সিদ্দিকী অবশেষে কবি রফিক আজাদকে গণভবনে বঙ্গবন্ধুর কাছে নিয়ে গেলেন।

কবি রফিক আজাদ বঙ্গবন্ধুর কাছে যেয়ে সরাসরি বঙ্গবন্ধুর দু'পা জড়িয়ে ধরলেন। রফিক আজাদের তাৎক্ষনিক উপস্থাপনায় বঙ্গবন্ধুর বিশাল হৃদয়, নরম কলিজা শুধু বিগলিত হলো না,বঙ্গবন্ধু সাথে সাথে পরম আদর-মমতায় দরাজগলায় রফিক আজাদকে বললেন: 'এই হারামজাদা, তুই কি লিখছিস?'

কবি রফিক আজাদ বিগড়ে যাওয়া সন্তানের মত সিংহ-হৃদয় পিতার সাথে সেদিন কোন তর্ক করেননি। সন্তানের মতো শুধু কিছু স্বভাব-সুলভ কথা পিতাকে বললেন। বঙ্গবন্ধুর সহনশীল মনোভাব এবং মমত্ব ভরা বিরাট হৃদয়ে প্রশ্রয়ের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে নির্ভয়ে রফিক আজাদ বঙ্গবন্ধুকে বললেন, 'ক্যান? এই যে আপনি আমারে হারামদজাদা বললেন। আমি এই কথাই তো লিখেছি। আপনি কি আমারে গালি দিলেন? নাকি আদর করে বললেন? আমি তো ওই কথাই বলছি। পেটে আগুন জ্বললে সবাই যা বলে আমি তাই বলেছি। এখন আমি জেলে থাকলে কবিতা লিখব কী করে?'

রফিক আজাদের কথায় বঙ্গবন্ধু তখন বিপন্ন-বিস্ময়ে হতবাক হলেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন বিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ বাঙালি ক্ষুধার সাথে খুব পরিচিত। অভাব-অনটনের ঠিকানায় অনেকের স্থায়ী বসবাস। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কখনো মানুষ থাকে না। উদ্ভ্রান্ত-কাল্পনিক দৃষ্টিতে তারা পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটি মনে করে। সর্বগ্রাসী চোখে তারা পূর্ণিমার চাঁদকে ঝলসানো রুটি ভেবে তাকিয়ে থাকে। কিশোর সুকান্ত- যে সুকান্ত বঙ্গবন্ধুর গোপালগঞ্জে তাঁর জন্মের ৬ বছর পরে ১৯২৬-এ জন্মেছিলেন সেই সুকান্তর কবিতা বঙ্গবন্ধুকে হয়তো তখন আলোড়িত করলো, আচ্ছন্ন করলো:-

'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়,
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'

রফিক আজাদের কথায় বঙ্গবন্ধু মুগ্ধ হলেন, আলোড়িত হলেন। সমস্ত রাগ-অভিমান-কষ্ট ভুলে নির্দেশ দিলেন, 'তুই আরো লিখবি, এমনি করেই লিখবি। কাদেরের সঙ্গে মাঝেমধ্যে আসবি, তুই তো আমার মুক্তিযুদ্ধের কবি, দেশের কবি।'

স্বৈরশাসকরা সবসময় দেশের বলিষ্ঠ কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দেয়। তাদের কলমের অবিরত ধারাকে সারাজীবনের জন্যে নষ্ট করে দেয়। তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-মেধার উর্বর মস্তিস্কে ফলতে দেয়না কোন প্রতিবাদের ভাষা। স্বৈরতন্ত্রে জন্ম নেয় না কোন নান্দনিক কাব্য-কবিতা-নাটক-সাহিত্য। স্বৈরতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্রের গুণকীর্তনের জন্য, নতুন কেচ্ছা-কাহিনীর জন্যে কিছু অনুর্বর কবি-সাহিত্যিক উৎপন্ন করে থাকে। এই অনুর্বর মানুষগুলো আমাদের মগজে তথাকথিত কবি সাহিত্যিকের মতো কিছুদিন কিলবিল করে। তাদের ভোতা লেখা সাধারণত পাঠক পাঠ করে না। ঘৃণার সাথে কখনো হয়তো নেড়েচেড়ে ফেলে দেয়। স্বৈরতন্ত্র সবসময় প্রতিবাদী কণ্ঠকে বিপন্ন করে তোলে। প্রতিবাদী কণ্ঠকে নির্বাসনে পাঠায় রাষ্ট্রীয় শাসন-যন্ত্রকে ব্যবহার করে। এজন্যে বঙ্গবন্ধু স্বৈরতন্ত্রকে ব্যালট দিয়ে মোকাবেলা করেছেন। স্বৈরতন্ত্রের বুলেটকে তিনি কখনো ভয় করেননি। দিগন্তছেদি দৃষ্টি দিয়ে বঙ্গবন্ধু জনগণের ভাষা বুঝতেন বলেই কবি রফিক আজাদের সবধরণের জটিলতা নিরসনে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ডেকে তিনি আদেশ দিলেন কবির যেন কোন সমস্যা না হয়। কবি রফিক আজাদ যেন স্বাভাবিকভাবে লেখনি চালিয়ে যেতে পারে সে ব্যবস্থা বঙ্গবন্ধু করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসন থেকে একজন লেখকের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপত্য স্নেহের যে উদারতা তা সারা পৃথিবীতে বিরল। বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করে একজন বিপন্ন কবিকে জেল-জুলুম-হুলিয়া থেকে দূরে রাখলেন। বঙ্গবন্ধু এবং কবি রফিক আজাদের মাঝখানে মেডিয়েটরের দায়িত্ব পালন করে কাদের সিদ্দিকী সদ্য স্বাধীন দেশে নতুন একটি মামলাকে বেশি পথ হাঁটতে দেননি। কবি রফিক আজাদকে থানা থেকে আদালত, আদালত থেকে উচ্চতর আদালতে যেতে হয়নি। আইনজীবীদের চেম্বারে চেম্বারে আইনি সহায়তার জন্যে অতি কষ্টার্জিত অর্থ-কড়ি খরচ করতে হয়নি কবি রফিক আজাদকে।

তথ্যসূত্রঃ

* একেই বলে জ্ঞানী, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম), দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ই ডিসেম্বর,২০১৯

পদ্মার ঢেউরে মোর শুন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যারে

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বঙ্গবন্ধু সবসময় উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে আপসি মনোভাব পোষণ করতেন। মরমি শিল্পী পল্লীগীতি সম্রাট আব্দুল আলীমকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আরেকটি স্মৃতি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আব্দুল আলীমের দেশে থাকা নিয়ে নানাজনের, নানা মনে, নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। সাংস্কৃতিক জগতে গুণীশিল্পীদের বিরুদ্ধে ঈর্ষাকাতর অনেক দূর্বল প্রতিপক্ষের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৭১ সালে শিল্পী আব্দুল আলীম দেশে ছিলেন এই অপরাধে একটি বিরুদ্ধ শিল্পীগোষ্ঠী তাকে ব্ল্যাকলিষ্টেড করেছিলো। কাদের সিদ্দিকীর নিকট থেকে বঙ্গবন্ধু বিষয়টি জেনে তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীকে ডুগি-তবলা-হারমোনিয়ামের ব্যবস্থা করতে বললেন। অনুষ্ঠানে আব্দুল আলীমের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু ১০/১২ টি গান শুনলেন। 'পদ্মার ঢেউরে মোর শূন্য হৃদয়-পদ্ম নিয়ে যারে' শুনে বঙ্গবন্ধু এতই মুগ্ধ হলেন যে, অবশেষে গানটি তিন/চারবার আব্দুল আলীমকে গাইতে হলো। গান পরিবেশন শেষে বঙ্গবন্ধু তথ্যমন্ত্রী এবং বেতার-টেলিভিশনের ডিজিদের ডেকে বললেন সপ্তাহে যেন অন্যান্য শিল্পী থেকে আব্দুল আলীমকে একটি প্রোগ্রাম বেশী দেওয়া হয়। আব্দুল আলীম যেন সবার উপরে সম্মানী পায়। বঙ্গবন্ধুর এরকম আদেশ দেয়ার পেছনে কারণ ছিলো ব্ল্যাকলিষ্টেড হওয়ার ফলে শিল্পী আব্দুল আলীমের ইতোমধ্যে যে ক্ষতি হয়েছে তা যেন তিনি পুষিয়ে নিতে পারেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ভয়াবহ-করুণ পরিণতির পর শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে নেমে এসেছিলো অন্ধকার-অমানিশা। অনেক কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীকে অজানা অথবা সুনির্দিষ্ট কারণে (স্বাধীনতার স্বপক্ষ বলে) ব্ল্যাকলিষ্টেড করা হলো। তাদের মধ্যে অনেকেই মান-অভিমান করে প্রতিকারের জন্যে কোন আইন-আদালতে যায়নি। আবার কেউ কেউ আইনি প্রতিকারের জন্যে আদালতের দরজা পর্যন্ত এসেছিলো। কবি রফিক আজাদের ঘটনার মতো মরমি শিল্পী আব্দুল আলীমের ঘটনায় মেডিয়েটর হিসাবে কাজ করেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। এই কঠিন দায়িত্ব তিনি পালন না করলে স্বাধীন বাংলায় হয়তো আরো দুটো নতুন মামলা যুক্ত হত। প্রচলিত ধারণা থেকে বলা যায় একটি মোকদ্দমা শত মোকদ্দমার দরজা-জানালা খুলে দেয়। দেশ এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে যেকোন স্তরে, যেকোন পর্যায়ে আলোচনার জানালা খোলা রাখলে সমঝোতার একটা পথ তৈরি হয়। যে পথ দিয়ে আমরা আশা-আকাঙ্খা আর প্রত্যাশার ঠিকানায় পৌছাতে পারবো অনায়াসে।

তথ্যসূত্রঃ

* একেই বলে জ্ঞানী, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম), দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১০ই ডিসেম্বর, ২০১৯

গাফফার, খবরদার এরপর কারও চেহারা-সুরত নিয়ে ঠাট্টা করবা না

আন্তরিক হলে মানুষ সীমাহীন কাজের মধ্যেও সরস-সুন্দরভাবে আসর জমাতে পারেন। আসর জমাতে বঙ্গবন্ধু পাঁকা ওস্তাদ ছিলেন। বিষয়বস্তু এবং বিষয়বস্তুর বাইরেও তিনি আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। বঙ্গবন্ধু আসর জমাতে অনেক কৌশলী হলেও তাঁর উপস্থাপনার ধরণ ছিলো সহজ-সরল। আবার কখনো আন্তরিকতায় ভরা সরস আলোচনায় কাউকে কটাক্ষ করলেও তিনি তা স্বভাবসূলভ উপস্থাপনার মাধ্যমে স্বাভাবিক করতে পারতেন। তাঁর সঙ্গে যারা রাজনীতি করতেন, কাজ করতেন, একান্তভাবে মিশতেন, তারা তাঁর রসিকতাপূর্ণ আসরে বেশ মজা পেত। বঙ্গবন্ধু অনেক সময় শুধু রসিকতার জন্যে রসিকতা করতেন, আবার কখনো রসিকতার মধ্যে কোন স্পষ্ট ইংগিত দিতেন। বঙ্গবন্ধুর রসিকতায় যদি কোন ইংগিত থাকতো তাহলে তা অবশ্যই হতো দিগন্তছেদি। সর্বোপরি রসিকতায় বঙ্গবন্ধু কাউকে কটাক্ষ করলেও তাঁর মধ্যে একটা চমৎকার মানানসই ঘটনা থাকতো। বঙ্গবন্ধু আলোচনার আসরে যে রসিকতার পরিচয় দিতেন তা চমৎকারভাবে এবিএম মুসার "মুজিব ভাই" বইটিতে পাওয়া যায়। ওই বইয়ে এবিএম মুসা বঙ্গবন্ধুর বেশ কয়েকটি সরস ঘটনা উল্লেখ করেছেন। প্রাসঙ্গিক সরস ঘটনাটি হলোঃ-

> "একদিন গণভবনের সান্ধ্য আসর বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় উত্তেজিত তাহের উদ্দিন ঠাকুর এসে উপস্থিত, 'নেতা, এই যে গাফ্ফার কী লিখেছে আমার সম্পর্কে দেখেছেন? লিখেছে, আমি নাকি সরাইলের

> কুকুর।' বঙ্গবন্ধু জানতে চাইলেন, কেসটি কী? যা জানা গেল, তা হলো, গাফ্ফার তখন মন্ত্রী কামরুজ্জামান হেনা ভাইয়ের সদ্য প্রকাশিত *দৈনিক জনপদ*- এর সম্পাদক। তাহের ঠাকুর সেই পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেওয়ায় আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তথ্য মন্ত্রণালয়ের কড়া সমালোচনা করে প্রতিমন্ত্রীকে 'সরাইলের সারমেয়' লিখেছিলেন। সরাইলের কুকুরকে তখন বিলেতি অ্যালসেসিয়ানের পর্যায়ের দুর্ধর্ষ মনে করা হতো। প্রতিমন্ত্রী ঠাকুরের আদি বাড়ি সেই এলাকায়।
>
> ঠাকুরের নালিশ শুনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন মুজিব ভাই। গাফ্ফারের দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন, 'অন্যায় করেছ! তাহেরকে সরাইলের কুকুর বলা ঠিক হয়নি। জানো, কত প্রজাতির কুকুর আছে?' তারপর বলতে শুরু করলেন, 'বিলেতি মেমসাহেবরা কোলে বসিয়ে ল্যাপডগকে আদর করেন। অষ্ট্রেলিয়ায় রাখালেরা তাদের ভেড়ার পাল সামলায় শেফার্ড কুকুর লেলিয়ে দিয়ে। উত্তর মেরুর বরফের ওপর চাকাবিহীন এস্কিমোদের বাহন টেনে নিয়ে যায় স্লেজ কুকুর। বিলেতের অভিজাত জমিদার ডিউকেরা বছরে একবার শিয়াল শিকারে বের হয়। প্রথমে জঙ্গলে ছেড়ে দেয় হান্টিং ডগ। সেই সব ভয়ংকর-দর্শন কুকুর শিয়ালদের তাড়া করে। তাদের পেছনে ঘোড়ার পিঠে থাকে শিকারিরা। ইউরোপে অ্যালসেসিয়ান কুকুর বাড়ি পাহারা দেয়। দুর্ধর্ষ এসব অ্যালসেসিয়ান অনেকটা সরাইলের কুকুরের মতো দেখতে, পাতলা লম্বা ভয়ংকর-দর্শন।' তারপর গাফ্ফারকে বললেন, 'আমার ভজহরির মতো এমন ঘাড়ে-গর্দানে নাদুসনুদুস, ফরসা, তবে হ্যাঁ, রাগলে লালমুখো হয়ে যায়, একধরনের কুকুরও আছে বৈকি। সেগুলো হলো বুলডগ, লালমুখো, মোটাতাজা শরীর।' আড় চোখে সুদর্শন নাদুসনুদুস তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থেমে গিয়ে দুষ্টুমি ভরা গলায় বললেন, 'গাফ্ফার, খবরদার এরপর কারও চেহারা-সুরত নিয়ে ঠাট্টা করবা না।' কথাগুলো বলেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর মুখে ঠেকানো পাইপটির তামাকে আগুন দেওয়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমরা হাসি লুকানোর জন্য মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মুখ তুলে দেখি, লালমুখো ঠাকুরমশাই ততক্ষণে উধাও।'

ঘটনাটি পাঠকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হলেও সমঝোতার দৃষ্টিতে অনন্য। কল্পনার মানস চোখে আমরা যদি ওই সময়ে গণভবনের ওই দৃশ্য কল্পনা করি তাহলে দেখতে পাই একজন সফল মধ্যস্থতাকারী বঙ্গবন্ধুকে। দৈনিক জনপদ-এর সম্পাদক আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী এবং মন্ত্রী পরিষদের সদস্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুরের সাথে যে ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো এবং দুই পক্ষ পরস্পর পরস্পরকে রুখে দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুতিও নিয়েছিলো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তা হাস্যরসের মাধ্যমে সমাধান করে দিলেন। বঙ্গবন্ধু বুঝেছিলেন গাফ্‌ফার এবং তাহেরের বৈরিতা অনেকদিন ধরেই। নইলে ক্ষমতার জোরে তথ্য প্রতিমন্ত্রী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন কমিয়ে দিতেন না। কলমের জোরে পত্রিকার সম্পাদকও অপর পক্ষকে সারমেয় বলতেন না।

কষ্টের কথা, বেদনার কথা, পরিতাপের কথা, মধ্যস্থতাকারী বঙ্গবন্ধু যতগুলো বিখ্যাত কুকুরের নাম বলেছিলেন সেসব কুকুরের মধ্যে এমন কোন কুকুরের জাত ছিলো না, যে কুকুর তার মনিবের সঙ্গে প্রতারণা করে। এমন কোন কুকুরের জাত ছিলো না, যে কুকুর সুযোগ বুঝে তার মনিবকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'ঘাড়ে গরদানে, নাদুসনুদুস ফর্সা কুকুরটি' সফল মধ্যস্থতাকারী বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে সফল হয়েছিলো।

তথ্যসূত্রঃ

* মুজিব ভাই, এ.বি.এম মূসা ঃ প্রথমা প্রকাশন, পৃঃ ২৯

মনোরঞ্জন ধর ব্যাচেলর মানুষ

বঙ্গবন্ধু নিজের মন্ত্রীদের নিয়ে মাঝে মধ্যেই রসিকতা করতেন। বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২ সালে স্বদেশে ফিরে এসে দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রী-পরিষদ গঠন করেন। ১৯৭২ এর জানুয়ারী মাসের কোন এক বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করার পর বঙ্গবন্ধু স্বভাব সুলভ প্রাণবন্ত আড্ডায় বসলেন। মন্ত্রী পরিষদ তখনও তিনি ঘোষনা করেননি। কোন দপ্তরবন্টন করেননি। বঙ্গবন্ধু একপর্যায়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্যে একটুখানি কৌতুহল প্রকাশ করে আড্ডার মাঝখানে বললেন 'সব এখন বলবো না, একটু পরেই জানতে পারবা। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যথাযথ দায়িত্ব দিয়েছি।' তারপর বঙ্গবন্ধু বললেন স্বাস্থ্য ও জন্মনিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কাকে দেয়া যায় তা নিয়ে তিনি খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তবে এখন আর দুশ্চিন্তা নেই। অনেক ভেবেচিন্তে একজন যোগ্য লোককে ঠিক করেছেন ওই মন্ত্রণালয়ের জন্যে। এরপর বঙ্গবন্ধু রসালো ভঙ্গিমায় জানালেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন্ত্রণালয়ের যোগ্যমন্ত্রীর নাম চাটগাঁয়ের জহুর আহম্মেদ চৌধুরী।

আলোচিত মন্ত্রণালয়ে জহুর আহম্মেদকে পছন্দ করার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করলেন, 'তাঁর মতো জহির আহম্মেদও জেল খেটে 'খ্যাংরা কাঠি'র মতো হয়ে গেছে'। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলে জহুর আহম্মেদ দেশের সব ডাক্তারকে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো করার জন্যে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবে। পক্ষান্তরে জহুর আহম্মেদকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়ার কারণও ছিলো। তখন সে তার পরিবারে ১৪ টি বাচ্চা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর স্বচ্ছ ভাবনায় ছিলো

বেশি বাচ্চা হওয়ায় জহুর আহম্মেদ ছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ কেউ ভালো বুঝবে না এবং ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না। এসব ভেবেচিন্তেই বঙ্গবন্ধু তাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু জহুর আহম্মদকে শুধু এভাবে মূল্যায়ন করেই ক্ষান্ত হননি। ১৯৭২ সালে ১৭ই মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যখন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন তখন তিনি বেঙ্গালুরু সিল্কের কিছু শাড়ি এনেছিলেন উপহার দেয়ার জন্যে। এই উপহারগুলো ছিলো ১৪ জন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীর বেগমদের জন্যে। উল্লেখ্য, শাড়িগুলো ইন্দিরা গান্ধী যখন মন্ত্রী মহোদয়দেরকে উপঢৌকন দিচ্ছিলেন তখন বঙ্গবন্ধু ছোঁ মেরে আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধরের শাড়িটি কেড়ে নিয়ে জহুর আহম্মেদ চৌধুরীকে দিয়েছিলেন। ইন্দিরাজি অবাক হয়ে বঙ্গবন্ধুর দিকে তাকালে বঙ্গবন্ধু বললেন, "মনোরঞ্জন ধর ব্যাচেলর মানুষ। তাঁর শাড়ির দরকার নেই, বেচারা চৌধুরীর দুই বউ এক শাড়ি নিয়ে টানাটানি করবে তাই তারটি জহুরের আরেকটি বউয়ের জন্য দিলাম।'

সদ্য স্বাধীন দেশে এই প্রথম কোন সরকার প্রধান বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। সরকার প্রধান হিসাবে ছিলেন ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা। তাঁর সামনে বঙ্গবন্ধু হাসি-তামাসার মাধ্যমে অপূর্ব রসিকতায় সমঝোতা করে জহুর আহম্মেদ চৌধুরীকে দুই বউ এর 'সতিনী মার্কা ঝগড়া-ফ্যাসাদ' থেকে রক্ষা করেছিলেন।

তথ্যসূত্রঃ

* মুজিব ভাই, এবিএম মূসা ঃ প্রথমা প্রকাশন

টাকা আমি গুনি না মেপে রাখি

বঙ্গবন্ধু সারাজীবন দক্ষ মাঝির মতো নৌকা বেয়েছেন। ভিন্ন ভিন্ন ঘাট থেকে, ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি তাঁর নৌকাটি সোনার বাংলার তীরে ভিড়িয়েছিলেন। আবার কখনো বঙ্গবন্ধু মার্জিত রুচিবোধে, স্বচ্ছ-নিষ্কলুষ সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে, নানা ফুলে সুবাসিত করতে চেয়েছেন তাঁর সোনার বাংলাকে। এ কারণেই তিনি নানা প্রান্তের, নানা দেশ থেকে মনের মাধুরী মিশিয়ে আনতে চেয়েছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান-কৃষি-শিল্পকলা থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন সহ সকল প্রকার উন্নত প্রযুক্তি। সদ্য স্বাধীন দেশে রাষ্ট্র এবং সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি চেনা-অচেনা, ছোট-বড় সীমাহীন সমস্যা চিহ্নিত করেছিলেন। বিশেষ করে মাত্র সতেরো/আঠারো বছর বয়সে জেল খাটা শেখ মুজিব আইন ও বিচার বিভাগের সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। দেওয়ানি আদালতে চাকরিজীবী বাবার কাছ থেকে ছোট বেলা থেকেই কোর্ট-কাচারির নানা সমস্যা শুনতে শুনতে বড় হয়েছিলেন। বাবা এবং গুরুজনের কাছ থেকে জেনেছিলেন মামলার কারণে তাঁর পূর্বপুরুষ কলকাতায় নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলো। মামলার বেড়াজালে শেখ বংশ সর্বস্বান্ত হয়েছিলো। তিনি তাঁর বাবা এবং গুরুজনদের কাছ থেকে আরো জেনেছিলেন, মামলার বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ হয়ে শেখ বংশের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়েছিলো, জমিদারি শেষ হয়েছিলো। সামান্য তালুক এবং খাস জমির উপর নির্ভর করে সংসার চালাতে হয়েছিলো শেখ বংশের পূর্বপুরুষদের। বঙ্গবন্ধু শেখ বংশের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাইরে যেয়ে বিকল্প উপায়ে সমস্যা সমাধানের চিন্তা করতেন। আলাপ-আলোচনার জন্যে সবধরণের পথ

খোলা রাখতেন। তিনি ফলপ্রসূ আলাপ-আলোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পছন্দ করতেন, তা আমরা শেখ বংশের অতীত থেকেই জানতে পারি। শেখ বংশের অতীত ঘটনাগুলো ছোট ছোট পটভূমিতে রচিত হলেও সেখানে আপস মীমাংসার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তীতে শেখ বংশের ঘটনাগুলো আমাদের দেশ-সমাজ ও আন্তর্জাতিক পরিসরে মেডিয়েশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু উদ্ভূত পরিস্থিতি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আপস-মীমাংসা করতে পছন্দ করতেন, চেষ্টা করতেন। আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছাতে বঙ্গবন্ধু কখনো সফল, কখনো বিফল হয়েছেন। মেডিয়েশনের উদার দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে আন্তরিক চেষ্টা করেছেন, সেটিই হচ্ছে মেডিয়েশনের আলোকিত জগৎ। জয়-পরাজয় নয়, বিষয়ের গভীরে গিয়ে, সমস্যা এড়াতে আলোচনা করাই হচ্ছে মেডিয়েশনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আশা করা যায় মেডিয়েশন নিয়ে যারা ভাবেন, গবেষণা করেন, তাদের জন্যে এটি একটি নতুন দিগন্ত হবে, নতুন বিষয় হবে।

শেখ বংশে অর্থ ও সম্পদের অভাব ছিলো না। তাদের বর্ধনশীল জমিদারীর সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যেও পসার ছিলো। শেখ বংশের সবকিছু ধক্ষংসের কারণ মামলা-মোকদ্দমা। অতীত সন্ধানী বঙ্গবন্ধু নির্ভেজাল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, এদেশ ইংরেজ দ্বারা শাসিত-শোষিত না হলে শেখ বংশের সুনাম কোনভাবে ক্ষুন্ন হতো না। তিনি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র শুরুতে আবেগঘনভাবে তাঁর পূর্বপুরুষ "কদু শেখের" কথা বলেছেন। কদু শেখ, কুদরতউল্লাহ শেখ বলে পরিচিত ছিলো। সেসময়ে সফল ব্যবসায়ী হিসাবে শেখ বংশে শেখ কুদরতউল্লাহর অবদান ছিলো ঈর্ষণীয়। সংসার ধর্মের পাশাপাশি সর্দার হিসাবে সততা-সুনামের সাথে এলাকায় আচার-বিচার করতেন। এলাকাবাসী গর্ব এবং অহংকারের সাথে শেখ কুদরতউল্লাহ সম্পর্কে একটি ঘটনা মুখে মুখে বলে সুখ অনুভব করতো। ঘটনাটি অনেকে সত্য ঘটনা বলে বিশ্বাস করতো। এ ঘটনায় মিঃ রাইন নামক একজন ইংরেজ কুঠিয়াল সাহেবের নাম জড়িয়ে আছে। তিনি খুলনা এলাকায় কুঠি নির্মাণ করে নীল চাষ শুরু করেন। ইংরেজ কুঠিয়ালের ক্ষমতা এবং দাপটে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিলো। তিনি

সময় সময় অনেক মানুষের নৌকা আটকে মাঝিদের দিয়ে জোর করে কাজ করাতেন। কেউ বাধা দিলে ইংরেজ কুঠিয়াল অকথ্য ভাষায় গালি-মন্দ করতো। অত্যাচার করতো। এভাবে একদিন শেখদের নৌকাও আটক করে মাঝিদের দিয়ে জোর পূর্বক কাজ করাতে শুরু করলে ইংরেজ কুঠিয়াল রাইনের লোকদের সাথে শেখ বংশের দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলো। শেখ বংশের তখন সামাজিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিলো। ইংরেজদের সাথে শেখদের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর কোর্টে মামলা-মোকদ্দমা হলো। মামলায় প্রমাণ হলো ইংরেজ কুঠিয়াল অন্যায় করেছে। তখনকার আইনানুসারে কোর্ট আদেশ দিলো যত টাকা ক্ষতি হয়েছে শেখ কুদরতউল্লাহ জরিমানা করে তা আদায় করতে পারবে এবং ইংরেজ কুঠিয়াল তা দিতে বাধ্য থাকবে। শেখ বংশের সে'সময়ের উজ্জ্বল বাতিঘর শেখ কুদরতউল্লাহ ইংরেজ রাইনকে অপমান করার জন্যে 'আধা পয়সা' জরিমানা করলো । এই জরিমানার পূর্বে ইংরেজ রাইন মিনতি করে শেখ কুদরতউল্লাকে বলল, "যত টাকা চান আমি দিতে রাজি আছি, আমাকে দয়া করে অপমান করবেন না"। কারণ ইংরেজ রাইন জানতো "কালা আদমি" তাকে জরিমানা করেছে এটা ইংরেজরা জানলে ইংরেজ সমাজ কখনো তাকে গ্রহণ করবে না। ইংরেজ রাইনের মিনতিতে সাড়া না দিয়ে বুক চিতিয়ে সেদিন শেখ কুদরতউল্লাহ অহংবোধে বলেছিলেন, "টাকা আমি গুনি না, মেপে রাখি। টাকার আমার দরকার নাই। তুমি আমার লোকের উপর অত্যাচার করেছ; আমি প্রতিশোধ নিলাম"।

তথ্যসূত্রঃ

* অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

বাবা একটু পানি চেয়েছিলো

"টাকা আমি গুনি না মেপে রাখি" শেখ কুদরতউল্লাহর দাম্ভিকতার পর শেখ বংশ আর বেশিদিন অর্থ-বিত্ত-বৈভবে থাকতে পারেনি। ঘটনার কিছুদিন পর শেখদের আর্থিক অবস্থা নিচের দিকে নামতে শুরু করলো। অবশেষে শুধু শেখ বংশের আভিজাত্য থেকে গেল। ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজরা মুসলিমদের ভালো চোখে দেখতো না। এজন্যে ইংরেজ শাসনের শুরুতে মুসলিমদের বঞ্চিত ক'রে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন বেশী জমিদারিত্ব পেয়েছিলো। তার ধারাবাহিকতায় রাণী রাসমণি হঠাৎ জমিদার হয়ে কারণে-অকারণে শেখদের সাথে লড়াই শুরু করলো। দৃশ্যপটে দেখা গেলো ইংরেজরা রাসমণিকে এমনভাবে সাহায্য করলো যাতে শেখরা পরাজিত হয়। জমিদারিসহ কলকাতার সম্পত্তি এবং উল্টাডাঙ্গার আড়ৎ রক্ষা করার জন্য সেসময় জমিদার রাসমণির সঙ্গে শেখদের খুব মারামারি হলো। এতে জমিদার রাসমণিকে ইংরেজরা সবধরণের সাহায্য সহযোগিতা করলো । এ মারামারিতে শেখদের বিরুদ্ধে এবং রাসমণির পক্ষে তমিজুদ্দিন নামক একজন যোদ্ধা অংশ নিয়ে আহত অবস্থায় শেখদের হাতে বন্দি হলো। শোনা যায় যোদ্ধা তমিজুদ্দিন আহত থেকে পরবর্তিতে নিহত হয়েছিলো। এ ঘটনায় মামলা হলে শেখদের সবাই গ্রেফতার হয়। বহু সময় ধরে, বহু অর্থ খরচ করে শেখ বংশের লোকজন হাইকোর্ট থেকে মুক্তি পায়।

রাসমণি ঘটনার কিছুদিন পর টুঙ্গিপাড়ার অভিজাত শেখ বংশের সঙ্গে আরেক পুরাতন কাজী বংশের রেষারেষি শুরু হয়। এ'দু'বংশের মধ্যে আত্মীয়তা ও

ঘনিষ্ঠতাও ছিলো। অর্থ-সম্পদ ও শক্তিতে কাজী বংশ শেখদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কখনও পেরে উঠতো না। তারপরও এলাকায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কাজীরা অনেকদিন শেখদের সাথে আপ্রাণ লড়ে গেছে। কাজী বংশের একটি অংশ শেখদের আর অন্য একটি অংশ জমিদার রাণী রাসমণির সাথে সম্পর্ক রাখতো। রাসমণির পক্ষের কাজী বংশের কিছু লোকজন কিছুতেই শেখদের আধিপত্য সহ্য করতে পারতো না। কুটিল-জটিল কিছু মানুষের পরামর্শে তারা জঘন্য কাজের আশ্রয় নিতো। অধিকাংশ কাজী শেখদের সঙ্গে মিলেমিশে ভালো কাজ করতো। বাকী অংশের নেতৃত্ব দিতো সেরাজতুল্লাহ কাজী। এ'অংশটি ছিলো নষ্টভ্রষ্টনীতিতে বিশ্বাসী। তাদের খারাপ কাজের ধারাবাহিকতায় কোন এক কাক ডাকা ভোরে শেখ বাড়ীর গরুর ঘরের চালের উপর পাওয়া যায় সেরাজতুল্লাহকাজীর লাশ। খবর পেয়ে শেখ বংশের লোকজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ। মামলার খরচ যোগাতে শেখ বংশের পূর্বপুরুষ ক্লান্ত হয়ে দেউলিয়া ঘোষণা করে কলকাতা থেকে টুঙ্গীপাড়ায় চলে আসেন। শেখ বংশের ঐশ্বর্য্যের প্রতীক ছিলো কলকাতার সম্পত্তি। কলকাতার সম্পত্তি হাতছাড়া হবার পর শেখদের দৈন্যদশার বর্ণনা বঙ্গবন্ধু 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ

"আমার দাদার চাচা এবং রেণুর দাদার বাবা কলকাতা থেকে নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে চলে আসেন বাড়িতে। কলকাতার সম্পত্তি শেষ হয়ে যায়। তারপর যখন সকলে গ্রেফতার হয়ে গেছে, কেউই দেখার নাই- বড় বড় ব্যবসায়ী, মাঝি ও ব্যাপারীরা নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে উধাও হতে শুরু করলো। এর পূর্বে তমিজুদ্দিনের খুনে যথেষ্ট টাকা খরচ হয়ে গেছে। জমিদারিও নিলাম হয়ে প্রায় সবই চলে যেতে লাগল। বহুদিন পর্যন্ত মামলা চলল। নিচের কোর্টে সকলেরই জেল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে মামলা শুরু হলো। আমাদের এডভোকেট হাইকোর্টে দরখাস্ত করলো সিআইডি দ্বারা মামলা আবার ইনকোয়ারি করাতে। কারণ, এ মামলা ষড়যন্ত্রমূলক। হাইকোর্ট মামলা দেখে সন্দেহ হলে আবার ইনকোয়ারি শুরু হলো। একজন অফিসার পাগল সেজে আমাদের গ্রামে যায় আর খোঁজ খবর নেয়। একদিন রাতে সেরাজতুল্লাহ কাজীর তিন ছেলের মধ্যে কি নিয়ে ঝগড়া হয় এবং কথায় কথায় এক ভাই অন্য ভাইকে বলে, "বলেছিলাম না শেখদের কিছু হবে না, বাবাকে অমনভাবে মারা উচিত হবে না।" অন্য ভাই

বলে, "তুই তো গলা টিপে ধরেছিলি তাই তো বাবা মারা গেল।" বোনটা বলল, "বাবা একটু পানি চেয়েছিলো, তুই তো তাও দিতে দিলি না।" সিআইডি এই কথা শুনতে পেল ওদের বাড়ির পিছনে পালিয়ে থেকে। তার কয়েকদিন পরেই তিন ভাই ও বোন গ্রেফতার হলো এবং স্বীকার করতে বাধ্য হলো তারাই তাদের বাবাকে হত্যা করেছে।

শেখরা মুক্তি পেল আর ওদের যাবজ্জীবন জেল হলো। শেখরা মামলা থেকে বাঁচল, কিন্তু সর্বস্বান্ত হয়েই বাঁচল। ব্যবসা নাই, জমিদারি শেষ, সামান্য তালুক ও খাস জমি, শেখ বংশ বেঁচে রইল শুধু খাস জমির জন্য। এদের বেশ কিছু খাস জমি ছিলো। আর বাড়ির আশপাশ দিয়ে কিছু জমি নিষ্কর ছিলো। খেয়ে পরার কষ্ট ছিলো না বলে বাড়িতে বসে আমার দাদার বাবা চাচারা পাশা খেলে দিন কাটাতেন। সকলেই দিনভর দাবা আর পাশা খেলতেন, খাওয়া ও শোয়া এই ছিলো কাজ।"

শেখ বংশের এসব ঘটনা মুজিবের জীবনবোধে জাগিয়ে দিলো কথায় কথায় মামলা নয়, কথায় কথায় আইনি মারপ্যাঁচ নয়। ঘটনাগুলো তাঁকে তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনে জটিল-কুটিল পথ পরিহার করে মেডিয়েশনের সহজ-সরল পথে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। উল্লেখ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়ে, জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিতেন। সিদ্ধান্তগুলো পরবর্তীতে মেডিয়েশনের ভাবনাকে আলোকিত করেছে। আবার কখনো তাঁর সহজ-সরল-প্রাঞ্জল বক্তব্য মেডিয়েশনের আলো-আধারীর ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে। বঙ্গবন্ধু সবসময় জীবন-সমাজ-দেশ-বিদেশ-আন্তর্জাতিক পরিসরে আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখতেন। আলোচনার পথ কখনো বন্ধ করতেন না বলেই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশও 'বঙ্গবন্ধুর দ্যুতিময় মেডিয়েশন'-এর অপূর্ব জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত হয়েছিল।

তথ্যসূত্রঃ

* অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি

পিতা-পুত্র খেলার মাঠে শুধু মেডিয়েশনের স্নিগ্ধ আলো জ্বেলে ক্ষান্ত হননি। এর পূর্বে ১৯৩৮ সালে তাঁরা আইন-আদালতেও মেডিয়েশনের মহিমময় আলো ফেলেছিলেন। সুচতুর-ধুরন্ধর ইংরেজ, হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বীজ বপণ করে প্রায় দু'শ বছর ভারতবর্ষ শাসন-শোষণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় অন্যান্য স্থানের মতো গোপালগঞ্জেও সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ আছড়ে পড়ল। বন্ধু অথবা সমবয়সী 'মালেক'কে বন্দী করলো কোন এক দুর্জন। শেখ মুজিবসহ কয়েকজন মালেককে উদ্ধার করতে গেলে 'রমাপদ' নামের এক ব্যক্তির সাথে লাঠালাঠি হয়। ঘটনাটি নিয়ে মামলা হলে শেখ মুজিবসহ বেশ কয়েকজনকে আসামী করা হলো। এ নিয়ে শহরে খুব উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। মুজিবকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায়নি। রাতে অফিসারদের সাথে শলাপরামর্শ করে একটি কুচক্রী মহল মামলা দায়ের করলো। থানায় বসে কুচক্রী মহলটি এজাহারে উল্লেখ করলো 'মুজিব' ভিকটিমকে খুন করার চেষ্টা করেছে এবং লুটপাট ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়েছে। এ মামলায় আসামী ছিলো মুজিবের মামা, মুক্তার সাহেব, জহুর শেখ, শেখ নুরুল হক ওরফে মানিক মিয়া, সৈয়দ আলী খন্দকার, আব্দুল মালেকসহ অনেকে। মোদ্দাকথা, গোপালগঞ্জের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির ছেলেদের কাউকে বাকি রাখেনি। মামলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুজিবের মামাসহ অনেকে গ্রেফতার হলো। মুজিবের বাবা এলাকায় বিখ্যাত হওয়ায় তাদের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে দারোগা সাহেব কুণ্ঠিত ছিলো। দারোগা সাহেব চেষ্টা

ব্যাটার ব্যাপার, আমি বাবা আর হাঁটতে পারি না"। উপায়ান্তর না দেখে পিতা (অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারী) বিষয়টি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং পুত্রের (মিশন স্কুলের দলপতি) গৃহ শিক্ষক বাবু রসরঞ্জন সেন গুপ্তকে জানালেন। প্রধান শিক্ষক মহোদয় দু'জনের কাছে আদ্যোপান্ত জেনে তাঁর ছাত্রকে প্রস্তাব দিলেন, "তোমার বাবার কাছে হার মান। আগামীকাল সকালে খেল, তাদের অসুবিধা হবে"। ছাত্রটি হৃদয়ের গভীর থেকে তীব্র কষ্ট মিশ্রিত কিছু আবেগ আর তার এগারোজন খেলোয়াড়ের পরীক্ষাসহ দৃশ্যমান সমস্যা নিয়ে প্রধান শিক্ষককে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বোঝানোর মধ্যে ছিলো না কোন দুর্বিনীত আচরণ, ছিলো শুধু একজন ছাত্রের পক্ষে নিখাদ শিষ্টাচারিতায় তার শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে বোঝানোর অদম্য চেষ্টা আর প্রাণের আকুতি। অবশেষে সুবোধ ছাত্রটি- মিশন স্কুলের দলনেতা, শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষকের কথা মেনে নিলেন। পরের দিন সকালে খেলা হলো। অফিসার্স ক্লাবের নিকট মিশন স্কুল এক গোলে পরাজিত হলো। এ ফাইনালে মিশন স্কুল পরাজিত না হলে বছরের সমস্ত খেলায় স্কুলটির জয়ের রেকর্ড থাকতো।

সময়ের রং ও রেখার গভীরতায় নির্মোহ ইতিহাস সাবলীলভাবে স্বাক্ষ্য দিতে পারে ফাইনাল খেলায় প্রধান শিক্ষক যে আপস-মীমাংসা করলেন সেটাই হলো মেডিয়েশন। মাত্র সতেরো-আঠারো বছর বয়সে মিশন স্কুলের দলপতি, এ'বঙ্গীয় বদ্বীপের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শত দ্বিধায়, শত বাঁধা বিপত্তিতে তাঁর প্রধান শিক্ষক রসরঞ্জন সেনগুপ্তের কথা মেনে নিয়েছিলেন এবং অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি বাবা শেখ লুৎফর রহমানের ক্লাবের সাথে খেলতে সম্মত হয়েছিলেন। ঘটনাটি দ্বারা বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনে অপূর্ব মহিমায় মেডিয়েশনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। জাতির জনক ১৯৩৯ সালে খেলার মাঠে মেডিয়েশনের যে ভিত্তি স্থাপন করলেন তার উপর দাঁড়িয়ে আমরাও আজ শক্ত গাঁথুনিতে মেডিয়েশনের নতুন অবকাঠামো সৃষ্টি করতে পারবো-পারবো আরও স্পর্শ করতে মেডিয়েশনের নতুন দিগন্ত। আমাদের বিশ্বাস, দেশের জন্যে মানুষের জন্যে, ভালোবাসা আর প্রতিশ্রুতি থাকলে মেডিয়েশনের পুষ্টবীজ অনন্তকাল বেঁচে থাকবে এই বাংলার মাটি-জল-হাওয়ায়।

তথ্যসূত্রঃ

* অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

তোমাদের বাপ-ব্যাটার ব্যাপার, আমি বাবা আর হাঁটতে পারি না

দ্বিধাহীন-নির্ভীক ইতিহাস বলছে সময়টা ১৯৩৯ সাল। তখন গোপলগঞ্জ না গ্রাম, না শহর। পিতা-পুত্রের আপসহীন ক্রীড়া-যুদ্ধ। এ' যেন 'বিনা যুদ্ধে নাহি ছাড়ি সূচাগ্র মেদিনী'। পিতা হচ্ছেন অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি। পুত্র মিশন স্কুলের দলপতি। ইতোমধ্যে পাঁচ দিন ফাইনাল খেলা হয়েছে। গোপালগঞ্জবাসী বিস্ময়ে দেখলো কেউ কাউকে পরাজিত করতে পারছে না। খেলার ভাষায় সাধারণত যাকে 'ড্র' বলা হয়। পিতার অফিসার্স ক্লাবে টাকার অভাব ছিলো না। প্রতিদিন বাইরে থেকে নতুন নতুন নামকরা খেলোয়াড় আনতেন। পুত্র মিশন স্কুলের দলপতি, তাঁর কোন বিকল্প খেলোয়াড় সংগ্রহ করার মতো অবস্থা ছিলো না। তাঁর দলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এগারো জন খেলোয়াড়ের তালিকায় ছিলো একই নাম, একই মুখ। এরা শুধু কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে আবেগ-উচ্ছ্বাস আর অদম্য সাহসে প্রতিদিন খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। ফুটবল গোলের খেলা। গোল করার অদম্য প্রচেষ্টায় তারা সারা মাঠ দৌড়াচ্ছে, ঘামছে। তাদের দু'চোখে শুধু স্বপ্ন কীভাবে অফিসার্স ক্লাবকে পরাজিত করবে। ইতোমধ্যে অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি, মিশন স্কুলের দলপতিকে প্রস্তাব দিলেন, আগামীকাল সকালেই খেলা হবে। কারণ বাইরের খেলোয়াড় আর রাখা যাচ্ছে না। অনেক খরচ। নির্লিপ্তভাবে মিশন স্কুলের দলপতি প্রতিউত্তরে জানালো, আগামীকাল তাদের পরীক্ষা। এছাড়া তারা সবাই ক্লান্ত। সবার পায়ে ব্যথা। দু'চার দিন বিশ্রামের প্রয়োজন। নইলে তাদের হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিষয়টি আপস-মীমাংসা করার জন্যে গোপালগঞ্জ ফুটবল ক্লাবের সেক্রেটারি সাহেব ঊর্ধ্বশ্বাসে একবার ক্লাব সেক্রেটারির কাছে, একবার স্কুল দলপতির কাছে ছুটে যাচ্ছেন। কোন আপস-মীমাংসা না হওয়ায় সেক্রেটারি সাহেব অপার বিস্ময়ে বললেন, "তোমাদের বাপ-

করলো মুজিব যেন আপাতত অন্য কোথাও সরে থাকেন। দারোগার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মুজিবের ফুফাতো ভাই মুজিবকে প্রস্তাব দিলো ঃ

'মিয়াভাই, পাশের বাসায় একটু সরে যাও না'। বললাম, 'যাব না, আমি পালাব না। লোকে বলবে, আমি ভয় পেয়েছি'।

ইতোমধ্যে মুজিবের বাবা শেখ লুৎফর রহমান সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়ি এলেন। তাঁকে অনুসরণ করে দারোগা সাহেবও বাড়িতে ঢুকে আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনা বললেন। সমস্ত ঘটনা শুনে শেখ লুৎফর রহমান বললেন, 'নিয়ে যান'। দারোগা সাহেব জানালেন,'সিপাহি রেখে যাচ্ছি। মুজিব যেন খেয়েদেয়ে আসে'। খাওয়া-দাওয়ার পর থানায় গেলে তাঁকে কোর্ট হাজতে পাঠানো হলো। কোর্ট দারোগা মুজিবকে দেখে বললেন, 'মজিবর খুব ভয়ানক ছেলে। ছোরা মেরেছিলো রমাপদকে। কিছুতেই জামিন দেওয়া যেতে পারে না'। প্রতিবাদের চেতনা থেকে কোর্টের মধ্যেই হাকিমের সামনে মুজিব তখন সাহসী কণ্ঠে বললেন, 'বাজে কথা বলবেন না, ভালো হবে না'। মুজিবের সাহস এবং প্রতিবাদের ভাষায় উপস্থিত অনেকে বঙ্গবন্ধুকে কথা বলতে নিষেধ করলো। সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে শুধু মুক্তার সাহেবকে 'টাউন জামিন' দিয়ে সবাইকে জেল হাজতে পাঠানো হলো। কোর্ট দারোগা হাতকড়া পড়াতে হুকুম দিলে মুজিব রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এই প্রথম শেখ মুজিব জেল জীবনের অচেনা স্বাদ গ্রহণ করলেন। সাত দিন হাজতবাসের পর তাঁর জামিন হলো। বিষয়টি নিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেনঃ

'হক সাহেব ও সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কাছে টেলিগ্রাম করা হলো। লোক চলে গেল কলকাতায়। গোপালগঞ্জে ভীষণ উত্তেজনা চলছিলো। হিন্দু উকিলদের সাথে আব্বার বন্ধুত্ব ছিলো। সকলেই আমার আব্বাকে সম্মান করতেন। দুই পক্ষের মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে ঠিক হলো মামলা তারা চালাবে না। আমাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে পনেরশত টাকা। সকলে মিলে সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হলো। আমার আব্বাকেই বেশী দিতে হয়েছিলো। এই আমার জীবনে প্রথম জেল।'

আমরা যারা আইনাঙ্গনে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত। এ'অঙ্গনকে আমরা যারা এপর্যন্ত বহু বর্ণে, নানা রঙে বিকশিত করার চেষ্টা করেছি তারা এবিষয় থেকে মেডিয়েশনের শিক্ষা নিতে পারি। এঘটনাকে আইনাঙ্গনে মেডিয়েশনের 'বাতিঘর' বলা যেতে পারে। কোন ঘটনায় কেউ সম্মানজনক সমঝোতা করলে তা সংশ্লিষ্ট পক্ষের মেনে নেওয়া ভালো। সমঝোতার পথ খোলা থাকলে আমাদের দেশ-সমাজে অনেক দীর্ঘমেয়াদী জটিল-কুটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

তথ্যসূত্রঃ

* অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

মামলার ভয় দেখিয়ে লাভ নাই

ক্ষণজন্মা বঙ্গবন্ধুর জীবনে আরেকটি মেডিয়েশনের ঘটনা ঘটেছিলো। দেওয়ানি আদালতে চাকরিজীবী সেরেস্তাদার বাবা শেখ লুৎফর রহমান, জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ মুজিবের জীবনে যেন অফুরন্ত আলোর আধার। শেখ মুজিবের কাছে তাঁর বাবা যেন অশেষ সাহসের প্রেরণার উৎস। টুঙ্গিপাড়ায় তৃতীয় শ্রেণী সম্পন্ন করে গোপালগঞ্জে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন শেখ মুজিব। গোপালগঞ্জ তখন বাবা শেখ লুৎফর রহমানের কর্মস্থল। বাবার সান্নিধ্যে লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছিলেন শেখ মুজিব। রাতে বাবার গলা না ধরলে পুত্রের ঘুম আসে না। জীবনের বিচিত্র পটে, ঘটনার নানা পরিক্রমায় এবং পরিবেশ-পরিস্থিতির নানা বিন্যাসে শেখ মুজিব এভাবেই বাবা শেখ লুৎফর রহমানকে কাছে পেলেন জীবনের অষ্টপ্রহরে। সময় ১৯৪৩ সাল। তীব্র খাদ্যাভাবের বছর। শেখ মুজিব অনেকের সাথে আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানের দাবিতে গোপালগঞ্জে 'দক্ষিণ বাংলা পাকিস্তান' কনফারেন্স করবেন। তিনি গভীরভাবে ভাবলেন কনফারেন্স হলে তিন জেলার মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর জাগরণের সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি মুসলিম লীগের শক্তি বাড়বে, জনগণও সাহায্য পাবে। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জনাব মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরীসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে এ কনফারেন্সে আমন্ত্রণ করা হলো। অনাকাঙ্খিতভাবে কেউ কেউ বাধা দেওয়ায় নির্ধারিত জায়গায় কনফারেন্স না করে শেখ মুজিব তাঁর বাড়িতে "নৌকার বাদাম" দিয়ে পাঁচ হাজার লোক বসতে পারে এমন প্যান্ডেল তৈরী করলেন। কনফারেন্সের আগের রাতে বৈরী আবহাওয়ায় এবং ঝড়ে প্যান্ডেল ভেঙে যাওয়ায় নৌকার

বাদামগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলো। অনেক লোক সমাগমে ভাঙা প্যান্ডেলে স্বতঃস্ফূর্ত সভা হলো। কিন্তু বিপত্তি অন্য জায়গায়। কনফারেন্সে প্যান্ডেল তৈরী করার জন্যে যেসব মানুষের কাছ থেকে শেখ মুজিব 'বাদাম' ধার এনেছিলেন তারা কেউ ছেঁড়া 'বাদাম' নিয়ে গেলো, কেউ নিলো না। কেউ সামান্য টাকা নিয়ে 'বাদামের' দাবি ছেড়ে দিলো। সবকিছু তদারকির মাধ্যমে সমাধান করলেন শেখ মুজিবের বাবা শেখ লুৎফর রহমান। একজন শুধু বিরুদ্ধাচরণ করে মামলার ভয় দেখালো। মামলার ভয়ে ভীতু না হয়ে পুত্র শেখ মুজিবের পক্ষালম্বন করে পিতা শেখ লুৎফর রহমান বললেনঃ

'কিছু টাকা আপনি নিয়ে এগুলি মেরামত করায়ে নেন। মামলার ভয় দেখিয়ে লাভ নাই। যারা পরামর্শ আপনাকে দিয়েছে, তারা জানে না আপনার বাদাম যে এনেছি তা প্রমাণ করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।' শেষ পর্যন্ত উক্ত 'বাদামওয়ালা' উকিল নোটিশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সাহস করে আর মামলা করেননি।

বুদ্ধিমান-পন্ডিত-জ্ঞানী-বিচক্ষণ মানুষসহ সাধারণ মানুষের কাছে এটি মেডিয়েশনের উদাহরণ হতে পারে। ছোট ছোট বিষয়ে আদালতে না যেয়ে সম্মানজনক আপস করলে সাধারণ মানুষের সুখ-শান্তি আর স্বস্তির অভাব হবে না। আমাদের সবসময় মনে রাখা উচিৎ ছোট ছোট বিষয় নিয়ে আইন আদালতে যাওয়ার আগেই মীমাংসা করা দেশ-সমাজ তথা বিশ্বের জন্যে কল্যাণকর।

তথ্যসূত্রঃ

* অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমানঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

মেডিয়েশনে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানের মধ্যে ক্যাডিলাক গাড়ি

মেডিয়েশনের প্রসঙ্গ এলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং রাষ্ট্রপ্রধান আবু সাঈদ চৌধুরীর মধ্যে গাড়ি নিয়ে চমৎকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র চতুর্থতম দিবসে, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। একই দিনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের দ্বিতীয়তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন। শপথ গ্রহণের মাত্র দশ দিন পর ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান একটি ছোট গাড়িতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। রাষ্ট্রপ্রধানকে ছোট গাড়িতে দেখে বঙ্গবন্ধু মর্মাহত হয়ে পরের দিন ২৫শে জানুয়ারির রাতে বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের সাদা ক্যাডিলাক গাড়িটি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপ্রধানকে ফেরত পাঠান। উল্লেখ্য, এই গাড়িটি ইতোপূর্বে বঙ্গভবন থেকে পাঠানো হয়েছিলো বঙ্গবন্ধুর ব্যবহারের জন্যে। ২৬শে জানুয়ারি রাষ্ট্রপ্রধান একটি চমৎকার চিঠিসহ গাড়িটি আবার বঙ্গবন্ধুর কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। ক্যাডিলাক গাড়িটি নিয়ে বেশ কিছুদিন উভয়ের মধ্যে প্রীতিময় দর-কষাকষি হয়েছিলো। অবশেষে ঠিক হলো, উভয়ের কেউই গাড়িখানা ব্যবহার করবেন না। বিদেশের কোন রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সফরে এলে এটি ব্যবহার করা হবে।

বর্তমান মৃতপ্রায় আপসকামী মূল্যবোধকে কশাঘাত ক'রে জাগিয়ে তুলতে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানের মধ্যে প্রীতিময় সম্পর্ককে আমাদের মধ্যে আবারও উদ্ভাসিত করতে তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধানের চিঠিটি অবিকল তুলে ধরা হলো ঃ-

বাংলার বন্ধু, আমার প্রিয় নেতা, ১২ই মাঘ, ১৩৭৮

আপনি আমার সালাম গ্রহণ করবেন। আজ সকালে উঠে যখন শুনলাম যে আপনি কাল সন্ধ্যায় সাদা গাড়ীটি ফেরৎ দিয়েছেন, আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই গাড়ী আপনি ফেরৎ না নেয়া পর্যন্ত আমি অস্বস্তি বোধ করব।

এই গাড়ীটি জাতির জনক ব্যবহার করবেন। আশা করি আমাদের দু'য়েকটা কথা আপনি রাখবেন।

বড় শেভ্রলেট গাড়ীটা যুদ্ধের সময় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে গাড়ীটা মেরামতের জন্য গিয়েছিল। সেজন্যই সেদিন আপনি ছোট গাড়ী দেখেছেন। শেভ্রলেট গাড়ীটা এখন ফিরে এসেছে।

আল্লাহ আপনাকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছেন, এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আমাদের আর নেই। তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, জয় হোক বাংলার। আপনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বাধীনে দেশ বাঞ্ছিত পথে এগিয়ে যাক, এই আমি প্রার্থনা করি।

প্রীতিমুগ্ধ
আবু সাঈদ
চৌধুরী

স্বাধীনতার ঊষালগ্নে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানের মধ্যে গাড়ি বিষয়ক ঘটনায় আমাদের সামনে মেডিয়েশনের অপূর্ব ধারণাটি উপস্থাপিত হলো। পরিতাপের বিষয়, আমাদের মৃতপ্রায় বিবেকে এ ঘটনাটি কখনো আলোড়িত হয়নি। গাড়ি বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানের মধ্যে যে আপস-মীমাংসার

ঘটনাটি ঘটলো তা আমাদের জীবনে অবশ্যই চর্চা থাকা উচিৎ। চর্চা থাকলে আমাদের সমাজজীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে কোন সমস্যা সৃষ্টি হতো না। অনেক বিতর্কিত বিষয় থেকে মুক্ত থাকা সহজ হতো। স্বাধীন দেশে কোন্ পদে, কোন্ অফিসার, কোন্ গাড়ী বরাদ্দ পেলো তা নিয়ে আমাদের মধ্যে আজ আর কোনো বিভেদ কাজ করতো না। থাকতো না কোন অহেতুক প্রতিযোগিতার জন্যে অপ্রয়োজনীয় মাথাব্যথা।

তথ্যসূত্রঃ

* বঙ্গভবনে পাঁচ বছর, মাহবুব তালুকদার ঃ ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃঃ ১২

যে দেশে বিচার ও ইনসাফ মিথ্যার উপর নির্ভরশীল

পলাশীতে কোন যুদ্ধ হলো না। হলো প্রহসন। পলাশীর প্রান্তরে নিজের সেনাবাহিনীর কাছে ১৭৫৭-এর ২৩শে জুন বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা অসহায় হলেন, শঠতার শিকার হলেন। তাও আবার প্রধান সেনাপতির কাছে। প্রায় ২১০ বছর পর পলাশী দিবসে অর্থাৎ ১৯৬৬ এর ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার ডায়েরী লিখলেন আর এক স্বাধীনচেতা বঙ্গবাসী। তিনি আর কেউ নন- তিনি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি লিখলেনঃ

> "বাজে গাছগুলো আমি নিজেই তুলে ফেলি। আগাছাগুলিকে আমার বড় ভয়, এগুলি না তুললে আসল গাছগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন- আমাদের দেশের পরগাছা রাজনীতিবিদ- যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তাদের ধ্বংস করে এবং করতে চেষ্টা করে তাই পরগাছাকে আমার বড় ভয় হয়।"

অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে বঙ্গবন্ধু আগাছাকে ভয় পেয়ে তুলে ফেলতেন। গাছের মধ্যে আগাছা হলে সহসা চেনা যায়- সহসা উৎপাটিত করা যায়। মানুষের মধ্যে আগাছা হলে তিনি কীভাবে চিনতেন, কীভাবে প্রতিহত করতেন তা লেখেননি। কিন্তু তিনি পরগাছা রাজনীতিবিদ ঠিকই সনাক্ত করতে পেরেছিলেন- তাদেরকে ভয়ও পেতেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পরগাছা রাজনীতিবিদ সত্যিকারের দেশপ্রেমিকদের ধ্বংস করে। দেশপ্রেমিক হতে হলে রাজনীতি

করতে হবে- এমন কোন কথা নেই। একজন বিচারক, আইনজীবী, সেনাসদস্য, আনছার, পুলিশ, শ্রমিক, চাষা, ক্ষেতমজুর, কেরানী যে কেউ দেশপ্রেমিক হতে পারে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মাতামহ আলিবর্দী খাঁর ছায়ায় বেড়ে ওঠা মীর জাফর নামক পরগাছাকে আগেই সনাক্ত করতে পারলে, চিনতে পারলে- স্বাধীন বাংলায় ইংরেজরা সহসা প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রাজনীতির পরগাছা মোস্তাক-ঠাকুরদের চিনতে পারলে প্রকৃত দেশপ্রেমিক মুজিবকে স্বপরিবারে স্বজনসহ নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হতো না। বঙ্গবন্ধুর মতো দিগন্তছেদি দূরদৃষ্টির মানুষ আগাছা চিনতেন বলেই তা তুলে ফেলতেন। কিন্তু পরগাছাকে তিনি শুধুই ভয় করতেন, আসলে চিনতে পারেননি কখনো। আগাছা-পরগাছা যাই বলি না কেন- আমাদের দেশ-সমাজ-পরিবারে তার কোন অভাব নেই। কমতিও নেই। বঙ্গবন্ধু আগাছা-পরগাছার উপমা দিয়ে প্রকারান্তরে আমাদের অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা, প্রশাসন, বিচারসহ সব জায়গা সংস্কার করার তাগিদ দিয়েছেন। অহেতুক-অপ্রয়োজনীয় বস্তু সত্যিকারের বস্তুকে ধক্ষংস করে। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু আমাদের দেশে প্রচলিত আইন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বারবার বলেছেন। তিনি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন ঃ

> 'আমাদের দেশে যে আইন সেখানে সত্য মামলায়ও মিথ্যা সাক্ষী না দিলে শাস্তি দেওয়া যায় না। মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয়, আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়। যে দেশের বিচার ও ইনসাফ মিথ্যার উপর নির্ভরশীল সেদেশের মানুষ সত্যিকারের ইনসাফ পেতে পারে কি না সন্দেহ।'

এই সন্দেহ বঙ্গবন্ধুর মনে জেগেছিলো বিদ্যমান বৃটিশ আইন-কানুনের প্রয়োগ, প্রবর্তণ, এবং চর্চার কারণে। বৃটিশরা তাদের দেশে প্রচলিত কমন ল ভিত্তিতে আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলে। বৃটিশ প্রবর্তিত এ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ভারতের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। বৃটিশরা বিচার ব্যবস্থায় কোন আপসের জায়গা রাখে না। তাদের বিচার ব্যবস্থায় হার-জিতের লড়াই। বিচার শেষে যে মামলায় জিতে সে লাভবান। আর যে মামলায় হারে সে হয় ক্ষতিগ্রস্ত। অপরদিকে বৃটিশপূর্ব ভারতে বিচার-ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো বাদী ও বিবাদীর মধ্যে আপসের পরিবেশ

সৃষ্টি করা। ভারতবর্ষে চিরাচরিত বিচার ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ কখনো ছিলো না। বরং বিশ্বাস করা হতো সহসা সিদ্ধান্ত না হলে অবশেষে দু'পক্ষ ক্লান্ত হয়ে আপস করবে। বৃটিশের তৈরি বিচার ব্যবস্থায় বিচারকের সন্দেহের জায়গায় দুই পক্ষের মধ্যে আপস করার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ দুই পক্ষের মধ্যে সমান ভাগ করার বিষয়টি এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ব্রিটিশ আইনের নিয়ম হলো যেভাবেই হোক মামলায় এক পক্ষের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এই নতুন বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে বৃটিশরা ভারত উপমহাদেশে নতুন ভূমি ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ভূমি ব্যবস্থায় শহরে-গ্রামে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, চতুর, পরলোভী কিছু মানুষ নামক অমানুষ জাল দলিল সৃষ্টি করে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হতে শুরু করলো। অপর প্রান্তে সহজ-সরল কিছু মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্ব হতে শুরু করলো। অনেক ভেবেচিন্তেই ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশে ভূমি ব্যবস্থা আইন প্রবর্তন করে। এতে ভারতীয়রা নতুন করে ইংরেজদের কাছে অসহায় এবং বিপন্ন হলো। এই ভূমি ব্যবস্থায় বিচারকেরা মামলা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং বাদী, বিবাদী, ও সাক্ষীদের জেরা পর্যন্তও করেন। বিচারকেরা ইংরেজ হওয়ায় ভারতবর্ষের আঞ্চলিক ভাষা বুঝতেন না। অন্যদিকে মোকদ্দমার বাদী-বিবাদী-সাক্ষীরা ইংরেজী বোঝে না। বিচারপ্রার্থী অর্থাৎ বাদী-বিবাদী-সাক্ষীরা তাদের ভাষায় মামলা পরিচালনা করতে এলে বিচারক এবং বিচারপ্রার্থী উভয়েই ঝামেলায় পড়লো। সুযোগ বুঝে অর্থ-বিত্তশালী, লোভী, চিত্তহরণকারী কিছু মানুষ প্রচুর অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী-আইনজ্ঞ নিয়োগ করা শুরু করলো। ইংরেজ বিচারকরা সুবিধার জন্যে বিচার প্রার্থীদের বক্তব্য না শুনে ইংরেজী জানা আইনজীবীদের বক্তব্য শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। যে পক্ষের আইনজীবী ভালোভাবে ইংরেজীতে তার মক্কেলের হয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতেন- দেখা গেলো মামলার রায় সেই পক্ষের অনুকূলে যাওয়া শুরু করলো। এক্ষেত্রে আইনজীবীরা শুধু তাদের জ্ঞান-মেধা দ্বারা বিচারপ্রার্থীর পক্ষে আইনী সহায়তা দিয়ে থাকেন। কোন্ মামলায় কে জিতবে এটা নির্ধারণ করেন বিচারকেরা, আইনজীবীরা নন।

পক্ষান্তরে, বিলাতি কমন ল ব্যবস্থায় সাধারণ (অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ) মামলা ও অসাধারণ (গুরুত্বপূর্ণ) মামলার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সাধারণ (অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ) ফৌজদারী মামলায় কোনো আইনজীবী আদালতে

যেয়ে কোনো মামলা পরিচালনা করেন না। আদালতে যেয়ে বাদী এবং আসামী অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় নিজের দোষ স্বীকার করে বক্তব্য উপস্থাপন করে। পাশাপাশি ছোট-খাটো দেওয়ানী মামলায় বাদী-বিবাদী দু' পক্ষই আদালতে উপস্থিত হয়ে নিজেরাই তাদের বক্তব্য পেশ করে। কোনো আইনজীবী এসব মামলায় উপস্থিত হন না। ফৌজদারী মামলায় বেশিরভাগ অপরাধী নিজের অপরাধ স্বীকার করে নেয় এবং দেওয়ানী মামলায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত বিচারের পূর্বেই মামলা নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এসব মামলায় আইনজীবীদের তেমন কোন ভুমিকা থাকে না। বৃটিশ আইনজীবীরা শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ মামলায় অংশগ্রহণ করেন।

অপরদিকে আমাদের ভারত উপমহাদেশে বিচারক এবং বিচারপ্রার্থীদের ভাষা দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে আইনজীবীরা সব মামলায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ ইংরেজী ভাষা জানতোনা, বুঝতো না। অপরদিকে সুচতুর ব্রিটিশ বেশিরভাগ আদালতে ইংরেজদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিতো। সর্বোপরি ব্রিটিশ আইনগুলো ছিলো ইংরেজী ভাষায় প্রণীত। ইংরেজরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলো ভারত উপমহাদেশে সাধারণ মানুষকে কমপক্ষে চারটি সাম্রাজ্যবাদী ভাষার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। এই ভাষাগুলো হলো- সংস্কৃত, আরবী, ফার্সি, এবং উর্দু। সুযোগসন্ধানী চতুর ইংরেজ এই চারটি সাম্রাজ্যবাদী ভাষার সাথে আরেকটি ভাষা যুক্ত করার জন্যে ইংরেজী ভাষায় সমস্ত আইন প্রণয়ন করলো। বিচার ব্যবস্থায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এটি ছিলো ব্রিটিশদের একটা কূটকৌশল। একারণে ইংরেজী ভাষায় রচিত আইনগুলো ইংরেজ বিচারকদের বুঝানো বিচারপ্রার্থীর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। বিপদে-আপদে, বিষয় সম্পত্তি রক্ষার জন্যে কোন উপায় না পেয়ে বিচারপ্রার্থী মানুষ আইনজীবী বা উকিল নিয়োগ শুরু করলো। ইংরেজ বিচারকরাও তাদের সুবিধার জন্য আইনজীবীদের অংশগ্রহণ সানন্দে মেনে নিলেন। সহজ-সরল এদেশবাসীকে এভাবেই ইংরেজরা পদে পদে সমস্যায় ফেলেছে এবং নতুন সমস্যা সৃষ্টি করার জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। ইংরেজরা শিক্ষিত এদেশবাসীদের সহসা চাকুরী দিত না। দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত হয়েও চাকুরী না পেয়ে বেকারত্বের গ্লানি মোচনের জন্য অনেকে আইন পেশায় যোগ দেয়া শুরু করলো। ফলশ্রুতিতে

অনেক সৎ যোগ্য আইনজীবীর পাশাপাশি কিছু অর্থলোভী বিবেকহীন আইনজীবীর সৃষ্টি হলো এবং তাদের সাথে অর্থলোভী, পরসম্পদলোভী, পাপাচারি কিছু মানুষের আঁতাত গড়ে উঠলো। একারণে এদেশে কমন ল বিচার ব্যবস্থায় বিচারপ্রার্থী মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ হতে শুরু করলো।

বিচারপ্রার্থী কিছু মানুষ অনেক সময় কিছু অসৎ আইনজীবীর পরামর্শে ভূয়া সাক্ষী এবং জাল দলিল সৃষ্টি করে সহজ-সরল-নিষ্পাপ মানুষের সম্পত্তি দখলের পাঁয়তারা শুরু করলো। এসব ক্ষেত্রে অনেকে অনেক সময় সফলও হলো। অন্যায়ভাবে অসৎপথে সাময়িক লাভবান হতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন ফটকাবাজ-টাউটও সৃষ্টি হলো। এধরণের লোকেরা সাধারণত ভালো আইনজীবী নিয়োগ করে ভূয়া কাগজের উপর ফায়দা হাসিল করার চেষ্টায় লিপ্ত হলো। অভিজ্ঞতা ও বিদ্যাবুদ্ধির জোরে অর্থলোভী কিছু আইনজীবী এসব কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে থাকেন। এভাবেই ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রণীত 'জগা-খিচুরী' মার্কা কমন ল ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা করুণ থেকে করুণতর হয়ে উঠলো। দেশের মানুষ যখন অসহায়-বিপন্নবোধ করে তখন তারা বিচারাদালতে আসে ন্যায় বিচারের আশায়। ইংরেজ প্রণীত বিচার ব্যবস্থায় বাংলাদেশী তথা ভারতবাসীর হলো উল্টো।

আমাদের বিচার ব্যবস্থায় সবচেয়ে করুণ পরিণতি হলো বিবেকহীন মানুষ নামক এক ধরণের অমানুষের উত্থান। এসব অমানুষ সম্পদের পাহাড় গড়তে একধরণের বিবেকহীন আইনজীবীকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দিতে শুরু করলো। এই দুই শ্রেণীর কীটতুল্য অমানুষদের যোগসাজশে জাল দলিল ও ভূয়া সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে আদালতে মামলা পরিচালিত হতে শুরু করলো। ফলশ্রুতিতে আদালতে ব্যাপক জাল-জালিয়াতি শুরু হলো। সাময়িক লাভের আশায়, সামান্য অর্থবিত্তের লোভে মানবিক বোধশূন্য মানুষের সংখ্যা এদেশে এভাবে বাড়তে থাকে এবং তারা পাল্টাপাল্টি মামলা দায়ের করতে থাকে। সুযোগ বুঝে অসৎ কিছু আইনজীবী নিজেরা কৃত্রিম ব্যস্ততা সৃষ্টি করে পেশকারের সহায়তায় ঘন ঘন মামলার তারিখ পরিবর্তন করতে শুরু করলো। দিনের পর দিন এ অবস্থা চলার পর এক পর্যায়ে মামলার ভারে ন্যুব্জ হলো আমাদের

আদালতগুলো। স্বচ্ছতার সাথে দ্রুত মামলাগুলো নিষ্পন্ন করা না হলে বিচারপ্রার্থী মানুষগুলোর হাহাকার আর আহাজারি কখনও বৃথা যাবে না। বিচারের বাণী যতই নিভৃতে কাঁদুক- আজ হোক কাল হোক এ জঞ্জাল আমাদেরই পরিস্কার করতে হবে।

সমস্যার গভীরে যেয়ে সমস্যাগুলো দূর করতে হলে শতভাগ কমন ল ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থার এখন আর প্রয়োজন নেই। মৎস্যকুমারী (অর্ধেক মাছ, অর্ধেক মানবী) মার্কা কমন ল আমাদের সমস্যা দূর করার চেয়ে আরো সমস্যা সৃষ্টি করছে। এই পরিবর্তন অত্যন্ত কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। কমন ল পদ্ধতিতে বিচারের সুফল পেতে মূল সমস্যা হলো ভাষা। বিচারপ্রার্থীর ভাষা আর বিচারকের ভাষা ভিন্ন হওয়ায় যে মামলাগুলোতে আইনজীবীর প্রয়োজন ছিলো নেই- সে মামলাগুলোতেও আইনজীবীর প্রবেশ ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। বাস্তবতার আলোকে এখনতো এ সমস্যা থাকবার কথা নয়। স্বাধীনদেশের প্রায় শতভাগ নাগরিক বাংলা ভাষা বোঝে, জানে। বিচারপ্রার্থী, বিচারক, পেশকার, আরদালি সবাই একই ভাষাভাষির। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় পঞ্চাশ বছর হতে চললো- এখনও কেন সব মামলা-মোকদ্দমায় আইনজীবী নিয়োগ দিতে হয়। কারণ একটাই বৃটিশ প্রণীত ইংরেজী ভাষায় রচিত দূর্ভেদ্য আইন। আইনী বিষয়গুলো আরো বেশি দূর্ভেদ্য করার জন্য মক্কেলের পক্ষে একশ্রেণীর আইনজীবী আদালতের চাহিদা না থাকলেও ইংরেজীতে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিষয়টি সাধারণ মানুষকেও ভাবায়। আইনজীবী মহোদয় একজন বাঙালি, অপর পক্ষের আইনজীবী বাঙালি, আদালতের বিচারক বাঙালি, বিচারপ্রার্থী পক্ষদ্বয় বাঙালি, ঘোষিত রায় যেসব জায়গায় যেতে পারে- সম্ভাব্য জায়গাগুলোতেও সবাই বাঙালি- এক কথায় সবাই একই ভাষার মানুষ- তারপরও কিসের টানে, কিসের মোহে ইংরেজী ভাষা চর্চিত হচ্ছে- বোধগম্য নয়। মনে হয় ওই অদৃশ্য টানেই (অর্থোপার্জনের হীন কৌশল অথবা ঔপনিবেশিক মানসিকতার কারণে) হয়তো এখনও দেশীয় ভাষায় উপযোগী করে কোন আইন প্রণীত হচ্ছে না।

স্বাধীন স্বপ্নের সোনার বাংলায় বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারী ১৯৭২-এ এসেই বললেন "বাংলায় যে লোকেরা আছে, অন্য দেশের লোক, পশ্চিম পাকিস্তানের

লোক, বাংলায় কথা বলে না। আজও বলছি তোমরা বাঙালি হয়ে যাও"। আক্ষেপের বিষয়, বঙ্গবন্ধুর আদেশে আমরা এখনো পুরোমাত্রায় বাঙালি হতে পারিনি। বিচার ব্যবস্থাও বাঙালির মতো গড়ে তুলতে পারেনি। সমস্যার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নিম্ন আদালতে বাংলা ভাষা চর্চিত হলেও বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় এখনও হচ্ছে না। বাংলা ভাষায় আইনের বিষয়গুলোকে এত জটিল করে উপস্থাপন করা হয় যে, বাংলা ভাষায় রচিত 'রায়' বুঝতে অন্য আরেকজন আইনজীবীর শরনাপন্ন হতে হয়। উচ্চাদালত আন্তরিক হলে বিচারপ্রার্থী মানুষগুলো তাঁদের ভাষায় রায় পেতে পারে। পৃথিবীর বুকে একমাত্র ভাষাভিত্তিক স্বাধীনদেশে বিচারপ্রার্থী মানুষগুলো অন্যভাষায় রায় নিয়ে বাড়ি যায়- এটা আমাদের দেশ এবং জাতির জন্য কল্যাণকর নয়।বিচারপ্রার্থী মানুষের এ দূর্গতি দেখেই রবি ঠাকুর বলেছেন- 'আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'।

বাস্তবতার আলোকে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন না করলে কোনভাবেই বিচার ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। বিচার ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে প্রথমেই বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে হবে। এই স্বচ্ছতা আনতে হলে যত প্রকার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন তা অতি সত্বর গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করতে হবে। দ্বিতীয় বিষয়টি "Justice delayed is justice denied" দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বিচারাদালতে দৃশ্যমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করলে আজ আমাদের মনে হয় এ সমস্যাগুলো প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ থেকে এভারেষ্টের শিখর পর্যন্ত বিস্তৃত। এসমস্যাগুলো বুঝতে হলে সুপ্রীম কোর্টসহ দেশের ৬৪টি জেলা আদালতে ঝুলে থাকা ৩৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৫০টি মামলার তথ্য-উপাত্ত নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টসহ দেশের ৬৪টি জেলা আদালতে ঝুলে থাকা ৩৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭৫০টি মামলার হিসাব

পূর্বের অনিষ্পন্ন মামলাসহ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বিচারাধীন মামলার তথ্য উপাত্ত নিম্নের সারণিতে দেয়া হলোঃ

	বিচারাধীন দেওয়ানি মামলা	বিচারাধীন ফৌজদারি মামলা	অন্যান্য (কনটেম্পট পিটিশন)	মোট
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট (আপিল বিভাগ)	১৩,১৯৯	৭,১১৪	১২৯	২০,৪৪২
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ)	৯৫,৬২৪	৩,২৯,৩৩৫	রিট-৮১,৪৪৪ আদিম-১০,২৪৯ ৯১,৬৯৩	৫,১৬,৬৫২
অধস্তন আদালত (সকল জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং অধীনস্ত আদালতসমূহ, ট্রাইব্যুনাল এবং সিএমএম ও সিজেএম আদালত এবং অধীনস্ত আদালতসমূহ	১৩,২১,০৩৮	১৭,১১,৬১৮		৩০,৩২,৬৫৬
মোট	*১৪,২৯,৮৬১*	*২০,৪৮,০৬৭*	*৯১,৮২২*	*৩৫,৬৯,৭৫০*

প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় নিম্নাদালতে ৩০,৩২,৬৫৬টি মামলাসহ পাঁচ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার চুরানবক্ষইটি মামলা সুপ্রীম কোর্টে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।আদালতগুলোতে মামলা-মোকদ্দমা বৃদ্ধির ভয়াবহতা বুঝতে একটু পেছনের বিশ্বস্ত সূত্রের বরাদ দিয়ে বলা যায়, ২০১৬ সালের ১১ই জানুয়ারীতে বাংলাদেশের

প্রধান বিচারপতি তথ্য দিয়েছিলেন যে সারাদেশে সমস্ত আদালতে ৩০ লাখ মামলা এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে ৩ লাখ মামলা বিচারাধীন আছে। উপরোক্ত তথ্য যদি আমরা সত্যের কাছাকাছিও বিবেচনা করি তাহলে আমাদের এই ঘনবসতিপূর্ণ ছোট আয়তনের দেশে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মামলা নতুন করে যুক্ত হচ্ছে। নতুন সংযুক্ত হওয়া মামলা এবং পুরাতন মামলাগুলো কবে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে- সে আশা আজ আমাদের সুদূর পরাহত।

ভারতবর্ষে বৃটিশ প্রণীত বিচার ব্যবস্থায় মামলা নিষ্পত্তি করতে পুরো ভারতবর্ষ মামলার জটে এবং মামলার ভারে নুইয়ে পড়েছে। মামলার ভারে ভারতবর্ষ একপর্যায়ে ভারত মহাসাগরে এবং ছোট আয়তনের দেশ বাংলাদেশ-বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাবে। কথাটি এখন এভাবে বললে হয়তো অনেকে অতিরঞ্জিত মনে করতে পারেন। কিন্তু অদূর ভবিষ্যৎ বলছে 'সাধু সাবধান'। শুধু বাংলাদেশেই মামলা জট নয়। বিশ্বস্ত একটি জরিপ হিসাব কষে বলেছে, ২০০০ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে ২ কোটি ৫০ লাখ মামলা বিচারাধীন এবং যে হারে মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে সে হারে ঐ মামলাগুলো নিষ্পত্তি করতে ৩২৪ বছর সময় লাগবে। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশেও অনিষ্পন্ন মামলাগুলো নিষ্পন্ন করতে কয়েক শ' বছর সময় লাগবে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হয় অনেক অঙ্গের সমন্বয়ে। রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ তার নিজস্ব দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রকে সচল রাখে। প্রযুক্তির এ যুগে কোনো দেশ কোনো একটি বিষয়ে সফলতার আলোয় আলোকিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা সারা বিশ্বের নজরে আসে। আবার কোন অঙ্গ অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলে, তাও সারা বিশ্ব জেনে যায়। প্রযুক্তির এযুগে কোনো কিছু গোপন থাকে না। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঈর্ষনীয় উন্নতি করেছে। দূর্ভাগ্যবশতঃ বিচার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের কোন উন্নতি হয়নি। স্বাধীনতার পর বিচার ব্যবস্থা যে তিমিরে ছিলো, সেই তিমিরে এখনও আছে। বাংলাদেশে এখনও বঙ্গবন্ধুর কথাটিই যেন নির্ভেজাল সত্য মনে হয়। বঙ্গবন্ধুর কথাটি আবারও পাঠককে স্মরণ করে দেবার জন্য এখানে উদ্ধৃত করা হলো- "মামলা মিথ্যা দিয়ে শুরু করা হয়, আর মিথ্যা দিয়ে শেষ করতে হয়"।

এধরনের বিচার ব্যবস্থা অতীতের মতো এখনও চলতে থাকলে ব্যক্তির মতো রাষ্ট্রও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একটি দেশের বিদ্যমান ভাবমূর্তিতে চলমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাংকের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন চুক্তি নিয়ে সমস্যা অথবা বিবাদ সৃষ্টি হলে বাংলাদেশের আদালতের মাধ্যমে উক্ত বিবাদ নিষ্পন্ন করতে সময় লাগে ১৪৪২ দিন। অন্যদিকে সারা বিশ্বে গড়ে সময় লাগে ৬১৩ দিন। আমাদের বাংলাদেশে একটি দেওয়ানী মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে সময় লাগে প্রায় ৩৩ বছর। এই তথ্য-উপাত্ত একটি স্বাধীন দেশের জন্য সুখবর নয়। এ অবস্থায় একজন মূর্খ, অর্ধ-শিক্ষিত, সুশিক্ষিত, উচ্চ-শিক্ষিত, নিঃস্ব, প্রান্তিকজন, ধনাঢ্য ব্যক্তিও কি দুঃচিন্তাগ্রস্ত না হয়ে পারে? আমাদের দেশে চলমান সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থা এক কথায় আশাহীন, দিশাহীন। বিচার ব্যবস্থায় এ রকম অবস্থা চলতে থাকলে বিচার ব্যবস্থা অচিরেই চরম সংকটে পড়বে।

উপরোক্ত তথ্য উপাত্তের আলোকে আমরা শুধু ব্রিটিশ প্রচলিত কমন ল'কে দায়ী করতে পারি না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিচার বিভাগে চলমান প্রশাসন ব্যবস্থা। দীর্ঘদিন ধরে বিচার বিভাগের প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে পেশকার অথবা বেঞ্চ অফিসারদের দৌরাত্ম। এই পেশকার অথবা বেঞ্চ অফিসাররা মামলার নথি তত্ত্বাবধানে থাকে। আরেকটু এগিয়ে গেলে বলা যায় মামলার পরবর্তী তারিখ নির্ধারণে, আদালতের আদেশ জারীকরণে, মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণে এদের সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকে। ১৯৪৭ সালের পর অথবা ১৯৭১ সালের পর এই পদ্ধতি সৃষ্টি হয়নি। এই পদ্ধতি ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই চলে এসেছে। বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদ এখানে প্রযোজ্য "বিস্‌মিল্লায় গলদ"। বর্তমানে পেশকার অথবা বেঞ্চ অফিসারদের যে দুর্নাম তা তাদের পদ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই শুরু হয়েছে, এখনও বিদ্যমান।

ঘুষ বা দুর্নীতি যে শব্দই আমরা বলি না কেন, তা নিরসনের জন্য সর্ব প্রথম প্রয়োজন সততা। বিবেক জাগ্রত না হলে সততার ঘরে বসবাস করা বড় কঠিন। বিবেকহীন মানুষগুলো ব্রিটিশ আমলে পেশকার অথবা বেঞ্চ অফিসারের চাকরি নিয়ে বিচারক এবং বিচারপ্রার্থী মানুষের ভাষার সমস্যা পুঁজি করে দুর্নীতি শুরু

ক'রে আজও থামছে না। তাদের এ অবৈধ কর্মকান্ড বন্ধ করতে এ পর্যন্ত যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা এখন পর্যন্ত সফল হয়নি।

ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা না জানার কারণে তারা যে সমস্যায় পড়েছিলো সে সুযোগটা গ্রহণ করে পেশকারদের দুর্নীতিতে হাতেখড়ি। ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট বিচারপ্রার্থী মানুষের এবং সাক্ষীদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পেশকারদের সাহায্য নিতে শুরু করলেন। সুযোগে বিবেকহীন অসৎ পেশকাররা অর্থের বিনিময়ে বিচারপ্রার্থী মানুষের এবং সাক্ষীদের বক্তব্য পরিবর্তিত করে দিতো। মাসিক বেতনের চেয়েও বেশি উপার্জনের জন্যে ঐ সময়ে অনেক পেশকার পদোন্নতিও নিতে আগ্রহী ছিলো না। তার ধারাবাহিকতা এখনও চলছে। বিচারাদালতের এ দূরাবস্থা দেখে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে এসে বাংলাদেশের এর্টনী জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম প্রধান বিচারপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন করেন যে, সহায়ক কর্মকর্তাদের দুর্নীতিতে বিচারপতিদের সতর্ক থাকা উচিত (দৈনিক আমাদের সময়, ২০১০)।

বিচার ব্যবস্থায় মামলা নিষ্পত্তি করতে অধিক কালক্ষেপণের আরেকটি কারণ বিচার ব্যবস্থায় পুলিশের অপরিহার্যতা। ফৌজদারী মামলায় পুলিশের ভুমিকা অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা না করে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে ব্রিটিশরা এদেশে শাসন-শোষণ করার অনেক পূর্বেই এই ভারতবর্ষে পুলিশ কর্মকর্তারা শুধু দুর্নীতিবাজই ছিলো না, অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্যও ছিলো। এদেশীয় দারোগাদের কীর্তি পৃথিবীর অনেক কিংবদন্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। ব্রিটিশরা ক্ষমতা এবং শোষণকে অতি সহজে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্যে এদেশে বিদ্যমান সনাতন পুলিশী ব্যবস্থার উপরে শুধুমাত্র কিছু ব্রিটিশ অফিসার বসিয়ে দিয়েছিলো। পরিণামে অল্প টাকায় ব্রিটিশ সরকার তাদের কার্যসিদ্ধি করলেও এদেশের জনগণের বিন্দুমাত্র মঙ্গল হয়নি। কারণ ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী কোন ফৌজদারী মামলা করতে গেলে সাধারণতঃ স্থানীয় থানায় মামলা দায়ের করতে হয়। যা প্রাথমিক অবস্থায় এফ.আই.আর, এজাহার, অথবা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী হিসেবে পরিচিত। এই এফ.আই.আর এর উপর ভিত্তি করে পুলিশ তদন্ত করে একটি রিপোর্ট পেশ করে। তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে কোন অভিযোগ পেলে পুলিশ যে রিপোর্ট পেশ

করে তাকে চার্জশীট বলা হয়। পুলিশ তদন্ত করে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা না পেলে যে রিপোর্ট দাখিল করে তাকে ফাইনাল রিপোর্ট বলা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পুলিশ যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে অনেকাংশেই পুলিশের সততা, কর্মদক্ষতা, নিরপেক্ষতা, এবং পেশাগত দায়িত্ববোধের ছাপ দেখা যায় না। প্রচলিত আইন ব্যবস্থায় পুলিশের কাছে যে নালিশ করা হয় তার মধ্যে ৮৮ শতাংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি বেকশুর খালাস পায় অর্থাৎ ৮৮ শতাংশ ব্যক্তি তার অভিযোগ থেকে মুক্তি পায়। (১০০-৮৮)= মাত্র ১২ শতাংশ ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়ে বিভিন্ন মাত্রায় সাজাপ্রাপ্ত হয়। সূত্রটি বর্তমান পুলিশের কর্মদক্ষতাকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। সমস্যা জর্জরিত পুলিশের এ সীমাহীন ব্যর্থতায় বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আজ অপরাধীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। আমাদের বিচার ব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধুর আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন করতে হলে অবশ্যই পুলিশের কর্মপদ্ধতিতে ইতিবাচক নজরদারী বাড়াতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। সমস্যার বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে এখনই আমাদের কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

সদ্য স্বাধীন সোনার বাংলা গড়ায় বিভোর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রচলিত আইন-কানুনসহ অনেক কিছু পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। অবশেষে ১৯৭৫ সালের ২১শে জুলাই বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্ণরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু আবেগঘন নাতিদীর্ঘ একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তার অংশ বিশেষঃ

'আর, বিচার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি বদলে ফেলা দরকার। বিচারের নামে অবিচার আর চলে না। এবার নতুন একটা কাঠামো করুন। সোজাসুজি বিচার হয়ে যাক। যাওয়ার সময় একজন জামাইয়ের কাছে ব্রিফ দিয়ে যান, তার মরবার আগে পর্যন্ত মামলা চলতে থাকে। সাহেবরা এবার থানায় যান। থানায় গিয়ে ওকালতি করুন। আমার আপত্তি নাই,- সব থানায় নিয়ে যান। থানায় মানুষ অতি সহজে নৌকা ভাড়া করে পায়ে হেঁটে এসে বিচার পাবে। ডিস্ট্রিক্টে এসে, মানে সদরে এসে, বাংলার দুঃখী মানুষ কোন দিন বিচার পায় নাই। দেখুন গিয়ে, লোকে জেলের মধ্যে ফিফটি ফোর-এর আসামি হয়ে ছয় মাস, এক বছর পড়ে থাকে, কিন্তু তার পনের দিন জেল হয়। জীবনভর আমি জেল খেটেছি,

কয়েদিদের সাথে জীবন কাটিয়েছি। আমি জানি তাদের কী দুঃখ, কী কষ্ট। বিচার হোক, জেল খাটুক। কিন্তু বিচার হয় না, হাজতে থাকে। ফিফটি ফোর-এর এক বছর দু'বছর হাজত খেটে এক মাস জেল হয়। আর, এই যে এক বছর এগার মাস গেল, তার ক্ষতিপূরণটা কে দেয়? আবার অনেক সময় খালাসও হয়ে যায়। আমি এগুলোকে থানা লেভেলে নিয়ে যেতে চাই। পয়সাকড়ির আমাদের অভাব আছে, বুঝি। অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে পয়সা কিছু কম খরচ করতে হবে।'

মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার স্মৃতি রোমন্থন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষে দাঁড়িয়ে, স্মৃতির পথ ধরে আমরা হয়তো আমাদের কুশলী প্রজ্ঞায় তাঁর পরম কাঙ্খিত কিছু চাওয়াকে আইনে রূপ দিতে পেরেছি। ইতোমধ্যে মেডিয়েশনের উপর বঙ্গবন্ধুর অনেক চাওয়া আইনে উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের জীবনকে সুবাসিত করেছে। যার প্রেক্ষিতে আমরা পেয়েছি দেওয়ানি কার্যবিধি আইনের ৮৯এ ধারা (২০০৩ সালে সংযোজিত), অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ২২, ২৪ ধারা এবং ফ্যামিলি কোর্ট অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫ এর ১০ ধারা, দি আরবিট্রেশন অ্যাক্ট, ২০০১ কাস্টমস আইন, ১৯৬৯ এর ধারা ১৯২ ক (বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি) এবং মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪১ক (বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি)। আমাদের বিশ্বাস এ' আইনগুলো বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনা আর বক্তৃতার পুষ্ট ফসল। আরো বিশ্বাস করি আমাদের জগৎ-সংসারে দীর্ঘমেয়াদি জটিল-কুটিল যে সমস্যাগুলো সুপ্ত অবস্থায় আছে তা অচিরেই দূর হবে কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে। বঙ্গবন্ধুর শুদ্ধ-চিত্তের কাঙ্খিত চাওয়াকে বাস্তবায়ন করতে এখন আমাদের বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (Alternative Dispute Resulation) পদ্ধতিতে মামলা নিস্পত্তি করার কথা নতুন করে ভাবতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. কারাগারের রোজনামচা, শেখ মুজিবুর রহমানঃ বাংলা একাডেমি, পৃঃ ১১৭
২. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
৩. বাঙালির কণ্ঠ (বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, বিবৃতি ও ঘোষণার সংকলন)ঃ আগামী প্রকাশনী
৪. অবাক বাংলাদেশ ঃ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি, আকবর আলি খানঃ প্রথমা প্রকাশন

আমিনুল হক হেলাল

জন্ম ১ ৮ই নভেম্বর, ১৯৭০। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশাস্ত্রে এলএল.বি. (সম্মান), এলএল.এম.। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল থেকে ১৯৯৫ এবং ১৯৯৭ সালে যথাক্রমে আইনজীবী সনদ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী সনদ অর্জন। ২০১১ সালে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনের তালিকাভুক্ত আইনজীবীর সনদ অর্জন। আইন পেশায় এবছর তাঁর রজতজয়ন্তী। স্কুল জীবনে শিশুসংগঠন 'চাঁদের হাট'-এর সাথে সম্পৃক্ত এবং পরবর্তীতে 'চাঁদের হাট' কলেজ শাখার সাহিত্য বিভাগের দায়িত্ব পেয়ে বেশ কিছু 'দেয়ালিকা' এবং 'রংধনু' পত্রিকা সম্পাদনা। ব্যক্তিগত পরিসর থেকে অনিয়মিত সাহিত্য পত্রিকা 'কশাঘাত' সম্পাদনা একটি সাহসী পদক্ষেপ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে 'নাটোর লিও ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে সভাপতি নির্বাচিত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী আইন অনুষদে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতি-শীল ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে 'ছাত্র ঐক্য পরিষদ'-এর প্যানেলে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে 'শ্রেণী প্রতিনিধি' নির্বাচিত। ১৯৯৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী সমিতি (রুলা) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং প্রাক্তন সভাপতি। ৭ম শ্রেণীর ছাত্রের কাঁচা হাতে লেখা 'পথভ্রষ্ট মর্ত্যমানব' কবিতা প্রথম ছাপার অক্ষরে নাটোরের স্থানীয় পত্রিকা 'প্রকাশ'-এ প্রকাশিত। সেই থেকে আজ পর্যন্ত লেখার বাসনায়, লেখার চেষ্টায় ব্রত।

ISBN: 978-984-34-7451-5

BANGLADESH LAW TIMES

Published & Printed By : Samarendra Nath Goswami, Advocate, 24/1, Segunbagicha, At Present, 9, Circuit House Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Anubhuti Printing Works. Correspondence Address; Manager, BLT Sale's Center, Supreme Court Bar Bhaban (3rd Floor) Dhaka-1000, Bangladesh. Ph.02-9559554, 01712-281344 Price: Tk. 150.00